পথের বন্ধু

শচীন্দ্র মজুমদার

প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

নভেম্বর
১৯৩১

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

লেখকের অন্যান্য পুস্তক

বন্দীদের গল্প, ছোটদের খেলা ও ব্যায়াম, হারানো দিন, ভাগ্যের লিখন

উপহার

উৎসর্গ

শ্রীমতী অমিতা ও সবিতাকে দিলাম

পথের বন্ধু

এক

মাঘ মাসের দুর্জয় কনকনে শীত হলেও কানপুরের অধিবাসীদের ব্যস্ততার অন্ত নেই। ব্যবসায় বিরাট কেন্দ্র বলে এমনিতেই কানপুরে ব্যস্ততা লেগেই আছে, তার ওপর অস্কার সার্কাসের নিরন্তর গরম বিজ্ঞাপনে বাসিন্দারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। স্কুল-কলেজের ছেলেরা আশায় উদ্‌গ্রীব, কেননা, এত বড় এবং বিচিত্র সার্কাস আর কখনও ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেনি। সার্কাসটায় জাতিবর্ণ-নির্বিচারে জগতের যত সেরা খেলোয়াড় জড়ো হয়েছিল এবং ভারতীয় খেলোয়াড়েরও তাতে অভাব ছিল না, এই ছিল তার বিশেষত্ব।

ছেলের দল দিন গোনা আরম্ভ করেছিল। তাদের সে দিন গোনা শেষ হয়ে এক রাত্রে সার্কাসের খেলা আরম্ভ হল। দর্শকের ঠেসাঠেসি ভিড়ে অত বড় বিরাট তাঁবুটা কানায় কানায় ভরে গেল। যারা টিকিট না পেয়ে নিরাশ হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের দিয়ে বোধ করি অমন তিনটে তাঁবু পূর্ণ হতে পারত।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টার সময়ে খেলা শুরু হোল ঘোড়ার খেলা, যত্নশিক্ষিত নানা পশুর নানা রোমাঞ্চকর কারদানি, জিম্‌নাস্টিক ইত্যাদি দেখতে দেখতে অত বড় বিরাট জনসংঘের ছেলে বুড়ো প্রত্যেককে মাতিয়ে দিলে। দু'জন মালাবারী জোয়ান ঢালু তারের ওপর যা কৌশলময় খেলা দেখালে তা বিচিত্র হতেও বিচিত্র! এমন খেলা কেউ কখনও দেখেনি। খেলা একেবারে জমজমাট হয়ে উঠল।

দর্শকেরা প্রত্যেকে ভাবছে, এমন খেলা দশবার দেখলেও বোধ হয় আশ মেটে না। সার্কাসটা তখন যেন একটা দৈত্যপুরীতে পরিণত হয়েছে। যে এসে খেলা দেখায় সেই যেন একটা নূতন দৈত্য।

এমন সময়ে একজন ভীমাকার ভারতীয় খেলোয়াড় মখমলের পর্দা সরিয়ে খেলার আঙিনায় এসে মাথা নুইয়ে দর্শকদের অভিবাদন জানালে। সার্কাসের কর্তা তার পরিচয় দিলে, "ইনি ভানু সিং, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বলী, সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যায়ামবীর। সারা জগৎকে মুগ্ধ করে ইনি স্বদেশে এসেছেন।"

হাজার হাজার দর্শক মুগ্ধ নিষ্পলক দৃষ্টিতে ভানু সিং-এর পানে চেয়ে রইল। ভানু প্রভাতসূর্যের মতই নয়নাভিরাম। তার নগ্ন দেহে বীরোচিত মাংসপেশীর অদ্ভুত সমন্বয়ের সে কি অসীম সৌন্দর্য! সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো, তার নিশ্চল মূর্তি ভাস্করের স্বপ্ন বলে বোধ হচ্ছিল, যেন কোনও দেবতা মানুষের মূর্তি ধরে সামনে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দর্শকদের মুগ্ধ দৃষ্টির নীরব প্রশংসার প্রত্যুত্তরে ভানু সিং মৃদু হেসে আবার তাদের অভিবাদন করলে। এই সামান্য একটু নড়াচড়ায় তার উজ্জ্বল সমুন্নত দেহের পেশী তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল।

আঙিনার মাটিতে একটা শতরঞ্চি পাতা। তারপর সে এসে তার ওপর শুয়ে পড়ল। অনুচরেরা ধরাধরি করে বিরাট একটা কাঠের সাঁকো এনে ভানুর বুকের ওপর রাখলে। সে নিজেই ইতিপূর্বে একটা নরম ছোট গদি রেখেছিল বুকের ওপর; সাঁকোটা তার ওপর রাখা হল। ঘণ্টার শব্দ শুনে দর্শকেরা চোখ ফেরাতে দেখলে, অতিকায় একটা হাতি গজেন্দ্রগতিতে এগিয়ে এসে সাঁকোটার এক প্রান্তে দাঁড়াল। তারপর ভানু হাত তুলে হাতিটাকে

ইশারা করলে। আজ্ঞাবাহী দাসের মত হাতিটা ধীর-পায়ে সাঁকোর ওপরে উঠে মাঝখানে দাঁড়াল। ভানুর বুকের ওপর বিপুল চাপ দিয়ে সাঁকোটা মাটি থেকে উঠে গেল। ভানু তখন চেপটে গিয়ে মাটিতে মিশিয়ে গেছে যেন। তার মাথা ও পা দুটো দেখা যাচ্ছে, শরীরের বাকীটা যেন আর নেই। হাতিটা স্থির হয়ে দাঁড়াতেই দর্শকদের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ভানু বক্তৃতা আরম্ভ করে দিলে। সে অমানুষিক কীর্তি দেখে দর্শকেরা বোবার চেয়ে বোবা হয়ে গেল। এমন কীর্তি কখন স্বর্গে হয়নি, দৈত্যপুরীতেও ঘটেনি ; ঘটেছে কেবল মানুষের এই পৃথিবীতে, আর, ঘটিয়েছে পৃথিবীর কোটি কোটি মৃত ও জীবিত লোকেদের মাঝে একমাত্র এই ভানু সিং। হাতিটা চলে যেতে সাঁকোটা তুলে নেওয়া হল এবং চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে ভানু সিং চারিদিকে ঘুরে ঘুরে মাথা নত করে অভিবাদন করতে লাগল। মনে হচ্ছিল সে যেন কিছুই করেনি, একটুখানি শুয়ে ছিল শুধু। প্রশংসার উৎসাহের বিপুল করতালি ও চিৎকার-ধ্বনিতে কানপুর শহরটা সে রাত্রে কেঁপে উঠেছিল।

তারপর যা ঘটল তা অভাবনীয় ঘটনা। দর্শক কেন, সার্কাসের লোকেরাও বোধ করি সে রকম কোন ঘটনা আশা করেনি। হাতির খেলার পর এক দীর্ঘকায় জার্মান আঙিনায় এসে দাঁড়াল। ম্যানেজার তার পরিচয় দিলে, "এই হার্মান রেমার্ক, পৃথিবীর সব চেয়ে বড় মুষ্টি-যুদ্ধের মাঝারি ওজনের ওস্তাদ। দর্শকদের মাঝে কেউ যদি রেমার্কের সঙ্গে তিন রাউণ্ড লড়তে সক্ষম হয় তাহলে সার্কাসের পক্ষ থেকে তাকে পাঁচশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। রেমার্ক অজেয়, আজ পর্যন্ত একে কেউ পরাজিত করতে পারেনি।"

রেমার্কের কোমরে বিজয়ী বীরের গুটি তিন স্বর্ণখচিত পেটি শোভা

পাচ্ছিল। সে সেগুলো খুলে উঁচু করে তুলে ধরে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলে উঠল, "কে এ পেটিগুলো পরবার অধিকার পাবার সাহস রাখ, এগিয়ে এস। আমি পেটিগুলো বাজি ধরলুম।" ক্ষণ-কালের জন্য চারিদিকে স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল, আর, রেমার্ক সেই হাত-তোলা অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবজ্ঞার হাসি হাসতে লাগল। তাতে কত জোয়ান ছেলের বুক যে নিষ্ফল রোষে ফুলে উঠল তা বলা যায় না। হঠাৎ আঙিনা-ঘেরা ড্রেস সার্কল থেকে শালুর নীচু বেড়া লাফিয়ে পার হয়ে কালো ইংরেজি পোশাক-পরা একটি ছোকরা রেমার্কের সামনে প্রসন্নমুখে এসে দাঁড়াল এবং মাথা ইষৎ নমিত করে বললে, "আমি তোমার চ্যালেঞ্জ মেনে নিচ্ছি, কিন্তু আমাকে দশ রাউণ্ড লড়বার অধিকার দিতে হবে। বাড়ী থেকে লড়বার সাজ আনাতে আমার মিনিট দশেক লাগবে।"

রেমার্ক তাঁর কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে বললে, "সাবাস্, ছোক্‌রা! কিন্তু দশ পাক লড়বার জন্য তুমি বেঁচে থাকবে তো?"

দর্শকেরা কোলাহল করে উঠল। ম্যানেজার ঘোষণা করলে, "কানপুরের সঞ্জীব রায় রেমার্কের সঙ্গে দশ পাক ঘুষি লড়বে।" তা শুনে দেশী দর্শকেরা "বাবুসাহাব কী জয়" বলে চিৎকার করে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। কেউ বললে, "সাবাস হিম্মত," কেউ বললে, "সাবাস জওয়ান!"

দেখতে দেখতে খেলার আঙিনার মাঝখানে খোঁটা পুতে, দড়ি ঘিরে মুষ্টিযুদ্ধের আখড়া তৈরী হয়ে গেল। আখড়ার জমিতে ক্যাম্বিশের চাদর পাতার সঙ্গে সঙ্গে লড়বার স্বল্প-বাস পরে সঞ্জীব একজন সাহেবের সঙ্গে সেখানে এল। তার দেহ শাল গাছের মত মজবুত হলেও সে বালক। দর্শকেরা অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, কি

করে এ ছোকরা রেমার্কের মত একজন পাকা ওস্তাদের সঙ্গে লড়তে পারে! অনেক ইংরেজ ও গোরার দল সে রাত্রে সার্কাস দেখতে এসেছিল। তারাও বক্সিং-এর নামে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল! ইংরেজের হাজার জাত্যভিমান থাক, মুষ্টিযুদ্ধের বেলায় সেটা উবে যায়। দু'জন গোরা জোওয়ান এগিয়ে এসে সঞ্জীবের সাহায্যকারী (Seconds) হবার অনুমতি প্রার্থনা করলে। সঞ্জীব স্বীকার করতেই তারা তাকে তোয়ালে দিয়ে গা রগড়ে দিয়ে তার হাতে দস্তানা পরিয়ে দিলে। সঞ্জীব আখড়ায় ঢুকে নিজের কোণটায় একটা খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে জুতোর তলায় রজন ঘষতে লাগল। তারপর সে যখন হাত-পা ছুঁড়ে শরীর গরম করে নিচ্ছে, সেই সময়ে গায়ে ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে রেমার্কও এসে আখড়ায় প্রবেশ করলে। সে সঞ্জীবের দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে বললে, "তুমি তাহলে মারা যাবে বলে মনস্থির করেছ! কি বল?" সঞ্জীবও একটু হাসলে, সে কথার কোন উত্তর দিলে না।

আখড়াটার বাইরে দু'জন বিচারক এসে বসল, আর রেফারী হল একজন ইংরেজ কর্নেল। সঞ্জীব নিজের কোণে টুলে বসে তার সঙ্গী সাহেব ও গোরা দুটোর সঙ্গে কথা কইছিল এমন সময়ে ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে রেফারী হাঁক দিলে, "Seconds Out!" দু'পক্ষের সাহায্যকারীরা দড়ির ঘেরাটা গলে বাইরে চলে গেল এবং সঞ্জীব ও রেমার্ক এক লাফে আখড়ার মাঝখানে এসে দাঁড়াল। চলতি কায়দা অনুসারে রেফারী তাদের দু'জনকে কিছু উপদেশ দিলে। তারপর দুই যোদ্ধা করমর্দন করেই একলাফে সরে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে লক্ষ্য করতে লাগল।

শিকারী কোন জন্তু যেমন কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে

শিকারের গতিবিধি লক্ষ্য করে সঞ্জীবও তেমনি আখড়ার মাঝ-খানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রেমার্কের নড়াচড়া লক্ষ্য করতে লাগল। অল্প কিছু সময় তাদের পর্যবেক্ষণে কাটল। হঠাৎ রেমার্ক বিদ্যুদ্‌গতিতে এগিয়ে এসে সঞ্জীবের দাড়ি লক্ষ্য করে একটা বিরাট ঘুষি চালিয়ে দিলে। সঞ্জীব কিন্তু চক্ষের নিমিষে রেমার্কের বাঁ পাশে সরে গিয়ে তার ঘুষিটা ব্যর্থ করে বাঁ হাতে তার চোয়ালে একটা প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দিয়ে দূরে সরে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল আর বিপুল জনতা খুশী হয়ে কোলাহল করে উঠল। ঘুষিটায় অবশ্য রেমার্কের কোন ক্ষতি হল না, কিন্তু ছোট একটা ছেলের হাতের মার খেয়ে তার মুখ ক্রোধে ও লজ্জায় লাল হয়ে গেল। কিন্তু অভিজ্ঞ কোন যোদ্ধা কখনও ক্রোধে আত্মসংযম হারায় না, সে বেশ জানে যে তাহলে মার খেতে এবং হারতেও হয়। রেমার্ক তখনি নিজেকে সামলে নিয়ে সতর্ক হয়ে গেল। তারপর ওদের প্রথম পাকের বাকী সময়টা মারের ফাঁক খোঁজাতেই কাটল। পাক শেষের ঘণ্টা বেজে উঠতেই দুই যোদ্ধা নিজের নিজের কোণে গিয়ে দড়ির ওপর দুই বাহু বিস্তার করে দিয়ে বসল।

প্রথম পাকেই দুই প্রতিপক্ষ বোধ করি পরস্পরকে কতকটা বুঝে নিয়েছিল, কেননা দ্বিতীয় পাকটা আরম্ভ হতেই সঞ্জীব আত্মরক্ষার ভাবটা ত্যাগ করে আক্রমণের ফাঁক খুঁজতে লাগল। দু'জনেই দু'চারটে ঘুষি চালালে কিন্তু সেগুলো বাতাসের গায়ে গিয়ে লাগল, কোন কাজের হল না। সঞ্জীব সমুখ পানে ঝুঁকে পড়ে লড়ছিল, তার ব্যূহে ফাঁক পাওয়া যাচ্ছিল না। রেমার্কের একটা ধাপ্পার চালে ভুলে সে সরে যাবার জন্য একটু সোজা হতেই রেমার্ক

প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করে সঞ্জীবের দেহের ওপর ঘুষির প্লাবন বইয়ে দিলে। সঞ্জীব কোন রকমে তার পাল্লা ছাড়িয়ে নিরাপদ স্থানে সরে গেল বটে কিন্তু তার ঠোঁট কেটে ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল, তাতে তার দাড়িটা লাল হয়ে গেল। তার অনুত্তেজিত মুখের মৃদু হাসিটা দেখে দর্শকেরা বুঝলে যে সে ছেলেমানুষ হলেও সহজে দমে যাবার বা হার মানবার পাত্র নয়। সে রেমার্কের আরও দু একটা আক্রমণ পাঁয়তাড়ায় কাটিয়ে দিয়ে কতকটা সামলে গিয়েছিল। হঠাৎ সঞ্জীব তীব্র বেগে তার প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে দু'হাতে তার ওপর ঘুষি বৃষ্টি করতে লাগল। অসুবিধা বুঝে রেমার্ক একবার সঞ্জীবকে জড়িয়ে ধরলে, কিন্তু পেটে ও পাঁজরায় গোটা কয়েক প্রচণ্ড ঘুষি তাকে খেতে হল। সে পিছনের দিকে হটে গেল, সেই সঙ্গে তার চোয়ালের ওপর একটা বিষম ঘুষি এসে পড়ল। তাতে সেই জার্মান বীরের সাদা মুখে খানিকটা কালশিটের পোঁছ লেগে গেল। সঞ্জীব তাকে এমনি করে বাগে পেয়ে আক্রমণ বিষম করে তুললে, আর রেমার্ক সরতে সরতে একেবারে আখড়ার দড়ির ওপর গিয়ে পড়ল। সঞ্জীব বর্ধিত বিক্রমে আক্রমণ করতেই পাক-শেষের ঘণ্টা বেজে উঠে সে বাজিটা শেষ করে দিলে। নিজের নিজের কোণে ফিরে যেতেই দুই যোদ্ধাকেই তাদের সাহায্যকারীরা ভিজে স্পঞ্জ দিয়ে মুছিয়ে দিলে। ওদিকে উৎসাহিত দর্শকেরা বালকবীরের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে কলরব করতে লাগল।

তারপর তৃতীয় পাক থেকে সপ্তম পাক পর্যন্ত যুদ্ধটা আর তেমন ঘন বা প্রচণ্ডভাবে হল না। দ্বিতীয় পাকের পর থেকেই রেমার্ক যথেষ্ট সাবধান হয়ে গিয়েছিল। সঞ্জীবের তরফ থেকেও তেমন কোন জোরালো আক্রমণ হল না। রেমার্কের ব্যূহ একেবারে

নিরেট নিশ্ছিদ্র, তাতে ফাঁকের নামগন্ধও ছিল না। মুষ্টিযুদ্ধে ধাপ্পাবাজি একটা বড় কৌশল। সঞ্জীব দু'চারবার রেমার্ককে ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে পাকা ওস্তাদ, ধাপ্পায় ভুলল না। দু'জনেই মাঝে মাঝে পরস্পরের দেহের ওপর ঘুষি মারছিল, কিন্তু সে সব গায়ে মাখবার মত ঘুষি নয়। অষ্টম পাকের গোড়াতেই ধাপ্পা দিতে গিয়ে সঞ্জীব রেমার্কের কাছে মার খেলে। সুতরাং তার রেমার্কের শেষ আক্রমণের অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। যুদ্ধটায় তখন আর প্রথম দুটো পাকের উত্তেজনা ছিল না।

নবম পাকে কিন্তু যুদ্ধটা অন্য এক রূপ ধারণ করলে। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে রেমার্ক সিংহবিক্রমে সঞ্জীবকে আক্রমণ করলে এবং সে আক্রমণের প্রচণ্ড গতিতে সে অভিভূত হয়ে গেল। সঞ্জীব বার বার প্রতিপক্ষকে জড়িয়ে ধরে ক্লিঞ্চ্ করবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু চতুর জার্মান তাতে ধরা না দিয়ে সঞ্জীবের দেহের ওপর অবিরাম ঘুষি বৃষ্টি করে গেল। নবম পাকটায় রেমার্কের জিত সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

শেষ পাকে সঞ্জীবকে অতিশয় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। রেমার্ক বাঁ হাতে প্রচণ্ড গতিতে সঞ্জীবের চোয়াল লক্ষ্য করে ঘুষি চালাতেই সে মাথা নীচু করে ঘুষিটা এড়িয়ে গেল এবং ঘুষিটা তার মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে ব্যর্থ হল। তাতে রেমার্কের দেহের ভারসাম্য নষ্ট হল এবং সে টাল সামলাতে না সামলাতেই সঞ্জীব তার হাতের ফাঁক দিয়ে তার চোয়ালে ডান হাতের একটা ভয়ানক ঘুষি চালিয়ে দিলে। তাতে সেই জার্মান ওস্তাদ ছিটকে গিয়ে ক্যাম্বিশের চাদরের ওপর পড়ল। দর্শকের দল বিপুল হর্ষকোলাহলে সঞ্জীবের জয়ধ্বনি করে উঠলো এবং রেফারী ওপর দিকে ডান বাহুটা তুলে এক, দুই, তিন করে সময় গুনতে লাগল। আট পর্যন্ত গোনা

হতেই কিন্তু রেমার্ক এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে সঞ্জীবকে আক্রমণ করলে। দুই যোদ্ধাই এই শেষ মুহূর্তে যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় করতে কৃতসংকল্প হয়েছিল ; কিন্তু ঘোরতর যুদ্ধের মাঝখানেই ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠে সব শেষ করে দিলে। যুদ্ধের ফল সমান-সমান হলেও সঞ্জীবের পক্ষে সেটা অতিশয় শ্লাঘার বিষয় বলে জনতা তাকে করতালি দিয়ে, শিস্ দিয়ে, চিৎকার করে অভিনন্দন করতে লাগল ; সে জয়ধ্বনি আর যেন থামে না। রেমার্ক এগিয়ে এসে দু'হাতে সঞ্জীবের দুটি হাত ধরে সাদরে বললে, "সাবাস, রায়। খুব কম লোকই আজ পর্যন্ত আমার সঙ্গে দশ রাউণ্ড লড়তে পেরেছে। তোমার সঙ্গে লড়ে আমি খুশী হয়েছি। মনে কোরো না যে তোমাকে ছেলেমানুষ আর অনভিজ্ঞ ভেবে আমি আলগা দিয়ে লড়েছিলুম, আমি লড়েছিলুম পুরো দমে। এখন তোমার কাছে হারতেও আমার লজ্জা নেই। তুমি আমার সমান সমান যোদ্ধা।"

সার্কাসের কর্তা তখনি একটা থলে করে বাজির টাকাটা এনে হাজির করলে। কিন্তু সঞ্জীব শৌখিন লড়িয়ে, তার নগদ টাকা নেবার জো নেই। তাছাড়া সে ধনীর ছেলে। সে টাকাটা নিলে না। সার্কাসের তরফ থেকে টাকাটা সঞ্জীবের কলেজের খেলার ফাণ্ডে দান করা হল।

দুই

কানপুরের বিখ্যাত উকিল, তারাপদ রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র সঞ্জীব। তার বড় ভাই আগ্রা কলেজের অধ্যাপক ; মেজ ভাই বাপের সঙ্গে কানপুরেই ওকালতি করে ; সেজ ভাই এলাহাবাদে মিওর কলেজে

এম. এ. পড়ত। যে সময়ের কথা বলছি সঞ্জীব তখন কানপুর কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। তার আঠারো বছর বয়স হলেও দেহের উৎকর্ষের গুণে তাকে বয়সের চেয়ে বেশ বড় দেখাত। তারাপদবাবু অত্যন্ত শৌখিন লোক ছিলেন। শখগুলো মর্দানা অর্থাৎ পুরুষোচিত। সকল শখের মধ্যে দুটি অন্যগুলোকে ছাড়িয়ে উঠেছিল। প্রথমটি ছিল ঘোড়ার শখ। তিনি নিজে উৎকৃষ্ট ঘোড়সওয়ার ছিলেন এবং তাঁর সব কয়টি ছেলেও বেশ ভাল সওয়ার ছিল। বাড়িতে নানা জাতির পালোয়ান পোষা তাঁর দ্বিতীয় শখ। তারাপদবাবু নিজে ভাল কুস্তি লড়তে পারতেন। সেকালে এ অঞ্চলে ভদ্রসমাজে এসব চলতি রীতি ছিল। এই সব সঙ্গগুণে সঞ্জীবও সর্ববিধ ব্যায়ামে নিপুণ হয়ে উঠেছিল। যে সাহেবটি সঞ্জীব-রেমার্কের যুদ্ধের সময়ে সঞ্জীবের সাথী ছিল, তার নাম গার্ল্যণ্ড। সে মুষ্টিযুদ্ধের ব্যবসাদার বড় ওস্তাদ। সঞ্জীবের এই দিকে বেশী ঝোঁক ছিল বলে তারাপদবাবু গার্ল্যণ্ডকে মাইনে দিয়ে বাড়িতে রেখেছিলেন। ছাত্র ও ওস্তাদের খুব ভাবও ছিল, এবং গার্ল্যণ্ড সযত্নে সঞ্জীবকে নিজের সকল বিদ্যা দান করেছিল। বলা বাহুল্য যে, সঞ্জীব নির্ভীক এবং দুর্দান্ত ছেলে। কোন অসমসাহসের কাজ করতে পেলে তার আর আনন্দ ধরত না। তাই বক্সিং-এর মত তাদের আস্তাবলের সব চেয়ে বদমায়েশ ঘোড়াগুলো বশ করতে তার খুব ভাল লাগত। সঞ্জীব সকল খেলাধুলোতেও এমন পারদর্শী ছিল যে সে সাধারণ প্রতিযোগিতায় প্রায় সব কঠিন প্রয়াসলভ্য পারিতোষিকগুলো গত দু'বছর থেকে জয় করে আনছিল।

সঞ্জীবকে রেমার্কের এত ভাল লেগেছিল যে দু'দিনেই সে তার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব করে নিলে। অস্কার সার্কাস কানপুরে দিন বার

ছিল। প্রত্যহ এসে রেমার্ক সঞ্জীব ও গার্ল্যণ্ডের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধ অভ্যাস করত। সে অনেকদিন পৃথিবী-বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা, জ্যাক জনসনের কাছে শিক্ষানবিসি করেছিল। রেমার্ক সঞ্জীবকে রোজ বলত, "তোমাকে কিছুদিন কাছে পেলে আমি আমেরিকান কায়দা-কৌশল শিখিয়ে দিতে পারি।" গার্ল্যণ্ড ইংরেজ। এ কথা সকলেই জানে যে ইংরিজী কায়দার চেয়ে মুষ্টিযুদ্ধের মার্কিনী কায়দাটা অনেক শ্রেষ্ঠ। কানপুরের খেলার পর অস্কার সার্কাসের কলকাতায় যাবার কথা। একদিন রেমার্ক তারাপদবাবুর কাছে প্রস্তাব করে বসল, "সঞ্জীবকে আমার সঙ্গে কলকাতা পর্যন্ত যেতে দিন, যতটুকু পারি আমি তাকে শিখিয়ে দিয়ে যাই।" সঞ্জীবের নিরতিশয় আগ্রহ দেখে তারাপদবাবু সম্মতি দিলেন, বলে দিলেন যেন দিন বারোর বেশী কলকাতায় না থাকে। সঞ্জীব অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে রেমার্ক ও গার্ল্যণ্ডের সঙ্গে কলকাতায় চলে গেল।

* * * *

গড়ের মাঠে অস্কার সার্কাসের একটা ছোট শহরের মত বিরাট তাঁবুটার দরজায় রেমার্কের ছবির পাশেই সঞ্জীবেরও ঘুষি-বাগানো ছবি ঝুলতে লাগলো। তার নাম হল, The Unknown Fighter, অর্থাৎ অনামা লড়িয়ে। চারিদিকে বিজ্ঞাপন ছড়াল যে রেমার্কের সঙ্গে লড়বার পারিতোষিক ছাড়া এই অনামা লড়িয়েকে পরাজিত করে যে-কেউ পাঁচশো টাকা পুরস্কার নিতে পারে। কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেল যে এই নামহীন লড়িয়ে বেশ ছেলেমানুষ। তার কারদানি দেখবার জন্য কলকাতার দর্শকেরা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল।

কানপুরের মত কলকাতাতেও প্রথম রাত্রিতে সার্কাসে আশাতিরিক্ত ভিড় হল। লাটসাহেব থেকে আরম্ভ করে কলকাতার

গণ্যমান্য সামান্য, ইংরেজ, ভারতীয়, পার্শি, ইহুদী কেউ যেন আর বাকী রইল না। খেলার পর্যায়ে যথাসময়ে রেমার্ক আঙ্গিনায় এসে দাঁড়াল, এবং কানপুরের সেই রাতের মত নিজের সোনার পেটিগুলো মাথার উপর তুলে ধরে সে ঢালাও চ্যালেঞ্জ দিলে। কিন্তু কলকাতায় তার ভুবনজোড়া খ্যাতিটা অবিদিত ছিল না। যুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দেওয়া দূরে থাক, কেউ কোথাও একটা টুঁ শব্দও করলে না। সুতরাং রেমার্ক বাধ্য হয়ে গার্ল্যাণ্ডের সঙ্গে লোক-দেখানো যুদ্ধ করলে। তারপরেই করতালির তুফানের মাঝে সঞ্জীব এসে আঙ্গিনার মাঝে দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে নুইয়ে জনতাকে অভিবাদন করলে। রেমার্ক তার হয়ে গম্ভীর স্বরে চ্যালেঞ্জ দিলে। খানিকক্ষণ বিরাট তাঁবুটা থমথমে হয়ে রইল। তারপর একটি হৃষ্টপুষ্ট ফিরিঙ্গী যুবক আঙ্গিনার ভেতর লাফিয়ে এসে আহ্বানটা স্বীকার করলে। কলকাতার ফিরিঙ্গী সমাজে ও কেল্লার গোরার দলে মুষ্টিযোদ্ধার অভাব ছিল না।

যুদ্ধ আরম্ভ হতেই সঞ্জীব ক্রমাগত ধাপ্পার চাল দিয়ে নবাগতের বুদ্ধি পরীক্ষা করতে লাগল। প্রথম পাকটায় তারা কেউ কাউকে ছুঁলেও না। প্রতিপক্ষকে বুঝে নিয়ে দ্বিতীয় পাকের গোড়াতেই সঞ্জীব তাকে সিংহবিক্রমে আক্রমণ করলে। চকিতে তার দক্ষিণ মুষ্টি নবাগতের দুই বাহুর ফাঁক দিয়ে সজোরে গিয়ে তার চিবুকে আঘাত করলে। পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে সঞ্জীব নিজের দেহের সব ভারটা যেন সেই প্রচণ্ড ঘুষিটায় যোগ করে দিলে। তার প্রতিপক্ষ চোখে সরষে ফুল দেখে গোটা কয়েক পাক খেয়ে সশব্দে ধরাশায়ী হল। অবশেষে তার সাহায্যকারীরা তাকে তুলে নিয়ে গেল।
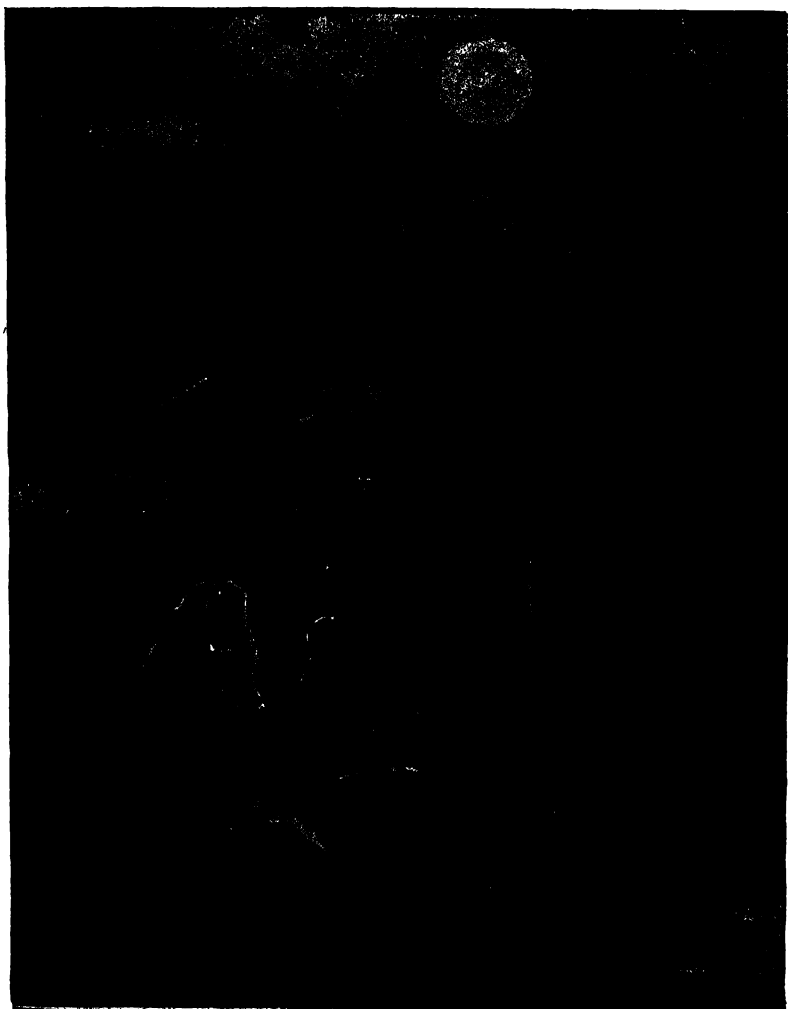
রোমাঞ্চিত সঞ্জীব দেখলে, টেরিয়র কুকুর যেমন লাফালাফি করে খেলা করে দুটো বাঘও তেমনি খেলায় মেতে উঠলো।

তারপর প্রতি রাত্রে সঞ্জীবের বিপক্ষেরা তার কাছে হারতে লাগল ; তাদের তিনটে করে পাকও টিকল না। দিনে দিনে যেমন সঞ্জীবের আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি পেতে লাগল, স্থানীয় মুষ্টিযোদ্ধাদের তাকে হারিয়ে দেবার জেদটাও তেমনি খুব বেড়ে গেল। ফলে সঞ্জীবকে অনেকগুলি বিপক্ষের সঙ্গে লড়তে হয়েছিল, কিন্তু তাতে তাকে কোনই বেগ পেতে হয়নি।

সার্কাসের খেলা শেষে সঞ্জীব রেমার্ক ও গার্ল্যাণ্ডের সঙ্গে বাসায় ফিরে আসত। সপ্তম রাত্রে তার কোন আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকবার কথা ছিল। সঞ্জীব সার্কাস থেকে বেরিয়ে পড়ল। প্রথমে তার ট্যাক্সিতে যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু খোলা মাঠের শীতটুকু তার এমন মিষ্টি লাগল যে, সে খানিকটা হাঁটতে মনস্থ করলে। নির্জন রাস্তা। একটা মোড়ে পদশব্দ শুনে সে পিছনে চেয়ে দেখলে যে অদূরে একটা ইংরেজের মত লোক আসছে। তাকে তারই মত পথচারী মনে করে সঞ্জীব অলস গতিতে নিজের গন্তব্য পথে চলতে লাগল। রাত্রি তখন একটার কাছাকাছি। প্রথমটা ভাল লাগলেও তার আর হাঁটতে ইচ্ছা করছিল না। কোন চলন্ত যাহোক-কিছু-একটা গাড়ি পাবার আশায় সে চারদিকে দেখতে লাগল। দু'চারখানা ট্যাক্সি তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কিন্তু কোনটাই আরোহিশূন্য নয়। এক একবার তার সার্কাসের বাসায় ফিরে যেতে ইচ্ছা হল, কিন্তু তখন সে এত দূরে এসে গেছে যে বাসা ও আত্মীয়ের বাড়িটা সমান-সমান দূরে। সুতরাং আত্মীয়ের বাড়ির সন্ধানে সে ওয়েলিংটন স্ট্রীটের দিকে যেতে লাগল।

পেছনের লোকটার কথা সঞ্জীব ভুলেই গিয়েছিল। সে এতক্ষণে এগিয়ে এসে সঞ্জীবকে ধরে ফেলে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার কাছে

দেশলাই আছে কি?” সঞ্জীব বললে, “না, সরি।” সে দু’চার পা এগিয়ে যেতেই যেন জাদুমন্ত্রে কোথা থেকে উদয় হয়ে একটা অন্য লোক তাড়াতাড়ি এসে অকারণে তাকে সজোরে ধাক্কা মেরে মুখ ফিরিয়ে হোহো করে হেসে উঠল। লোকটা ময়লা কাপড়পরা একটা তামাটে ফিরিঙ্গী। এই অভদ্র ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সঞ্জীব বাঁ হাতে সজোরে লোকটার নাকের উপর প্রবল একটা ঘুষি মারলে। সে দু’হাতে নিজের মুখ চাপা দিয়ে “মাই গড” বলে আঁতকে উঠে ফুটপাথের ওপরেই শুয়ে পড়ল। ঠিক সেই মুহূর্তে সেই পূর্বেকার লোকটা তার হাতের মোটা লাঠিটা দিয়ে সঞ্জীবের মাথার ওপর আঘাত করলে। সঞ্জীব জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তারপর সে-দু’জন লোক তাকে তুলে অন্ধকার একটা গলির মুখে নিয়ে যেতেই একটা সাহেব-চালিত মোটরগাড়ি ভেতর থেকে এগিয়ে এল। সঞ্জীবকে গাড়িটায় তুলে তারাও লাফিয়ে উঠে পড়ল এবং চকিতের মধ্যে গাড়িটা মুখ ঘুরিয়ে আবার ময়দানের পানে দ্রুতবেগে উধাও হয়ে গেল।

তিন

জ্ঞান ফিরে আসতে সঞ্জীব দেখলে সে একটা ছোট কামরায় অপরিসর শয্যায় শুয়ে আছে। তার গায়ের ওপর কে যেন বেশ যত্ন করেই খান দুই বিলাতী কম্বল ঢাকা দিয়ে গেছে। তার শয্যার বিপরীত দিকে আর একটা অপরিসর শূন্য শয্যা। তাতে যে কেউ শুয়েছিল তা বেশ বোঝা যায়। তার মনে হল, যতক্ষণই সে এ কামরায় থাক না কেন, একা ছিল না। তার অদেখা সঙ্গী বোধ হয় কিছু আগে

পর্যন্ত এই ঘরেই ছিল। দেওয়ালের খানিকটা ওপরে একটা কাঁচ-ঢাকা গোল জানলা দিয়ে কামরাটায় দিনের আলো এসে পড়েছে। জানলাটা দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠে বসতেই তার মাথার ভেতর দপদপ করে উঠল। সঞ্জীব মাথায় হাত দিয়ে দেখলে একটা জায়গা ঢিপি হয়ে ফুলে আছে, কিন্তু তেমন বেদনা নেই সেখানে। তার গত রাত্রির কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু সেসব অগ্রাহ্য করে অত্যন্ত আগ্রহসহকারে সে চারদিকে দেখতে লাগল; মনে হল যেন তার ঘরটা স্থির নয়, একটা গতিশীল বাড়ির অংশ সেটা। সঞ্জীব হঠাৎ ভাবলে, ঘটনাচক্রে সে কোন জাহাজের যাত্রী হয়ে পড়েনি তো? উত্তেজিত হয়ে উঠে পড়ে সে বন্ধ দরজাটা খুলতেই তার চোখের সমুখে সীমাহীন ঘোলা জলরাশি ভেসে উঠল। অবাক্ হয়ে সে সেই জল দেখছিল, এমন সময়ে একজন ইউরোপীয় তার ঘরে এল এবং হাসি-মুখে বললে, "গুড মর্নিং, রায়। এত সকালেই উঠে পড়েছ?" তাকে দেখবামাত্র সঞ্জীবের মনে হল, লোকটা গত রাত্রের সেই ধর্মতলার পথচারী। তাকে আঘাত করা ও চুরি করে আনার সঙ্গে এই লোকটার সম্পর্ক আছে ভাবতেই সঞ্জীবের মন ক্রোধে ভরে গেল ও মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হল। সেই সঙ্গে তার মাথার ঢিপিটাও দপদপ করে উঠল।

লোকটা বোধ হয় তার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল। সে সঞ্জীবের কাঁধে হাত রেখে হেসে বললে, "তোমাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে। কিন্তু তার আগে বাইরে এসে দাঁড়াও, ভোরের বাতাসে আরাম বোধ করবে।" তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে সঞ্জীব এগিয়ে গিয়ে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়াল। দূরে তখনও তটভূমির ঘন সবুজ রেখা স্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছিল, খানিক

সেই দিকে চেয়ে থেকে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলে, "ওটা কোন্ দেশ ?" সে বললে "তোমার বাংলা দেশ।" অপলক দৃষ্টিতে সঞ্জীব সেই দূরসঞ্চারী তটভূমির দিকে চেয়ে রইল ; চোখ দুটি তার অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। নিমেষের মধ্যে রেখামাত্রটুকুতে পর্যবসিত স্বদেশের মায়া, বাপ, মা, ভাই, ভগ্নী, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির মূর্তি তার চোখের সমুখে ফুটে উঠে তার অন্তরে হাহাকার জাগিয়ে দিলে। মায়ের স্নেহের কোল তখনও যেন দূরের তটভূমিতে মূর্ত হয়ে তাকে প্রগাঢ় স্নেহে আহ্বান করছে। বিদেশী, অচেনা সঙ্গীর সামনে সে কোন দুর্বলতা প্রকাশ করলে না বটে কিন্তু তার চোখে তখন জল টলটল করছিল। চোখ ফেরাতে গোপনে দু'ফোঁটা অশ্রু তার গাল বেয়ে পড়ল, যেন বিদায়বেলার প্রণামের ক্ষণের বুকভাঙা হাহাকার অশ্রু হয়ে মায়ের পা দুটিকে অভিষিক্ত করে দিলে। প্রবল বাতাস বোধ করি সে দু'ফোঁটা চোখের জল বহন করে বঙ্গোপসাগরের অগাধ জলে মিশিয়ে দিয়ে বাংলা মায়ের চরণ বিধৌত করে দেবার মত আরও সুপবিত্র করে দিলে।

সঞ্জীবের সঙ্গী এতক্ষণ চুপটি করে রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছিল। অদূরে গোটাকয়েক ডেক-চেয়ার সাজান ছিল, সে দু'খানা তুলে এনে বললে, "এসে বস, রায়, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।" সঞ্জীব বসে পড়ে তার দিকে চাইলে। লোকটা বলতে আরম্ভ করলে, "আমার নাম অটো হেঙ্গলার। অস্কার সার্কাসের মত আমিও হেঙ্গলার সার্কাসের মালিক এবং অস্কারের প্রবলতম শত্রু। আমরা এখন যে জাহাজটায় চলেছি সেটা একটা জাপানী মালবাহী কার্গো বোট। শ্যাম দেশ হয়ে এটা মালয়ে যাবে, সেখানে আমরা সেলাঙ্গরে নেমে পড়ব, কারণ আমার সার্কাস এখন

সেখানে খেলা দেখাচ্ছে। তোমাকে আমি খুব বড় একটা মতলব করে ধরে এনেছি। তোমাকে না হলে আমার চলবে না। সব বলবার আগে একটা কথা বলে রাখি যে আমার ওপর বিরক্ত হয়ে তোমার ক্ষতি বই লাভ নেই। তাহলে প্রথমতঃ কথা কইবার সঙ্গী পাবে না, কেন না এই জাহাজটায় আমি, জাহাজের ক্যাপ্টেন ও ফার্স্ট এঞ্জিনিয়ার ছাড়া আর কেউ ইংরেজী জানে না, তোমাদের দেশের কোন ভাষা জানার কথা তো ছেড়েই দাও। ও দু'জন ইংরেজী জানা লোক আমার অনুমতি ভিন্ন তোমার সঙ্গে কথাও কইবে না।

"এখন আসল কথাটা বলি। আমার সার্কাস যাতে সব বিষয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সার্কাস হয় আমি সেই চেষ্টাই করি। কিন্তু দুটো কারণে আমার অভিলাষ পূরণ হচ্ছে না, ভয়ানক বাধা হয়েছে। প্রথম, অস্কার সার্কাসের ভানু সিং। তার মত পৃথিবীতে আর একজনও নেই। তাকে আমি টাকার লোভ আর প্রাণের ভয় দেখালেও কোন রকমেই বাগে আনতে পারিনি। দ্বিতীয় কারণ, হার্মান রেমার্ক। তাকে আয়ত্তে আনা সহজ নয়। কারণ, সে শুধু অস্কারের আত্মীয় নয়। অস্কার তাকে প্রভূত অর্থ দেয়। তার ওপর হার্মান আমার চিরশত্রু।

"জার্মানিতে এখন রেমার্ক ও ম্যাক্স স্মেনিং ছাড়া বড় মুষ্টিযোদ্ধা নেই। ম্যাক্স কোন দলের নয়। অর্থের প্রতিও তার তেমন লোভ নেই। সে সমগ্র জার্মানজাতির জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্মান আহরণ করবার তপস্যা করছে। তাকে আমরা ছোট কিছুর লোভ দেখিয়ে জ্বালাতন করি না।

"আমার নিজের দল থাকলেও অস্কার সার্কাসকে অনুসরণ করে

বেড়ান আমার একটা বাতিকে দাঁড়িয়ে গেছে। ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও কানপুরে গিয়েছিলুম। সর্বত্র রেমার্কের অবিসংবাদী জয় দেখে আমি হিংসায় জ্বলে মরি। কিন্তু তোমার যুদ্ধ দেখে আমি সত্যই অত্যন্ত খুশী হয়েছিলুম। কারণ তুমি তার সঙ্গে সমান হয়ে তার বিজয় মুকুটের খানিকটা ভুবড়ে দিয়েছ। অপর কেউ হয়ত ভাবতে পারে যে তোমাকে ছেলেমানুষ দেখে রেমার্ক দয়ার্দ্র হয়ে ঢিলে দিয়ে লড়েছিল। কিন্তু আমি জানি যে সেটা এক ফোঁটাও সত্য নয়। রেমার্ক কখনও কাউকে দয়া করে না। সিংহ তার হিংস্র স্বভাব হয়ত বা কখনও ভুলতে পারে, কিন্তু রেমার্কের কোষ্ঠীতে ওরকম কিছু নেই। তাই সেদিন থেকে তোমার ওপর আমার নজর পড়েছিল। তারপর কলকাতায় আমি তোমাকে আরও বাজিয়ে দেখবার সুযোগ পেলুম। যে ক'জন প্রতিদ্বন্দ্বী সেখানে তোমার সঙ্গে লড়েছিল তারা সব আমার বাছাই করা লোক। আমি টাকা দিয়ে কলকাতার আর রেলের সব ক'জন নামজাদা মুষ্টিযোদ্ধাকে তোমাকে পরখ করতে পাঠিয়েছিলুম। তাদের পরাজয়ে আমি যেমন একদিকে খুশী হয়েছিলুম তেমনি আমার বেশ ভয়ও হয়েছিল যে তুমি যদি রেমার্কের সঙ্গে অস্কার সার্কাসে থেকে যাও তাহলে আমার দুরবস্থার আর সীমা থাকবে না, চিরদিন অস্কারের গৌরব দেখে আমাকে জ্বলেপুড়ে মরতে হবে। আমি জানি যে তুমি পয়সাওয়ালা লোকের ছেলে, হয়ত সার্কাসে ভিড়ে গিয়ে জীবন কাটান তোমার লক্ষ্য নয়। কিন্তু আমি কোন ঝুঁকি নিতে রাজী হলুম না। কে জানে তোমার সার্কাসে থেকে যাবার লোভ হবে কি না! তা ছাড়াও একটা কথা আছে। তোমার অসাধারণ প্রতিভা কলেজের বই এবং ভবিষ্যতে উকিল ব্যারিস্টারের গাউন দিয়ে চাপা দেবার মত অবহেলার জিনিস নয়। বছরে বছরে দু'চার হাজার

উকিল হয়; তোমার মত লড়িয়ে পঞ্চাশ বছরেও একজন হয় না। তোমাকে এনে এক হিসেবে আমি তোমার ও তোমাদের দেশের পুরুষালির উপকার করেছি। তোমাকে চুরি করতে আমাকে নোংরা কাজ করতে হয়েছে। তার জন্য এবং তোমাকে আঘাত করবার অপরাধের জন্য আমি মাফ চাইছি। ওটা অজ্ঞান করবার জন্য কায়দার আঘাত, তাতে কোন জখম হয় না।

"এখন আমি চাই যে তুমি আমার দলে থেকে একদিন রেমার্ককে নিপাত করবে। তোমার ওপর আমার এত আশা, এত ভরসা এই জন্য যে আজ পর্যন্ত তুমি ছাড়া তার সামনে আর কেউ টিঁকে থাকতে পারেনি। সুতরাং, বলতে গেলে তোমাকে আমি সমস্ত পৃথিবীটা খুঁজে যোগাড় করেছি। এখন দুটো জিনিসের মধ্যে একটা তুমি বাছাই করে নিতে পার, আমার বন্ধুত্ব ও ভবিষ্যতের শ্রীবৃদ্ধি; কিংবা, আমার শত্রুতা ও একান্ত নির্যাতনের জ্বালাময় জীবন। তোমাকে আমি ছাড়ছিনে, এ কথাটা বেশ জেনে রেখ। তোমাকে কাজে না লাগাতে পারি, সে-ও ভাল। তোমাকে আমি বাইরে ছেড়ে দিচ্ছিনে। বন্দী করে রেখে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে বেড়াব। আমার কথাটা বেশ সাফ করে বুঝে আর ভেবে দেখে পরে উত্তর দিও। সম্মতি যদি তুমি দাও তাহলে আনন্দ রাখবার আমার আর জায়গা থাকবে না। তোমার ঘরে বাক্সগুলোর ভেতর তোমার প্রয়োজনীয় কাপড়-জামা যথেষ্ট পরিমাণে পাবে। বক্সিং-এর সাজ-সরঞ্জামও অনেক আছে। তুমি একটু সবল হলেই এই জাহাজেই তোমার ট্রেনিং আরম্ভ করা যাবে, কি বল? এখন চল, খেয়ে আসা যাক।"

হেঙ্গলারের কথা শুনে সঞ্জীব অবাক্ হয়ে রইল। শখের খাতিরে কলকাতা বেড়াতে এসে সে যে এমন একটা চক্রান্তের

জালে জড়িয়ে যাবে, সে কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। কিন্তু তার বিষাদময় চিন্তার ভেতরেও কথাটা মনে করতেও সঞ্জীবের আনন্দ বোধ হচ্ছিল যে হেঙ্গলারের মত গুণগ্রাহী মানুষও তার জন্য এমন লোভী হয়ে উঠেছে। কিন্তু রেমার্কের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া সঞ্জীবের পক্ষে অসম্ভব কথা, কারণ সে তার গুরু হয়ে গিয়েছে তখন। তাছাড়া, জবরদস্তির সামনে যে মাথা নোয়ায় সে কাপুরুষ। সঞ্জীবের একগুঁয়ে প্রকৃতি। জবরদস্তির কথাটা মনে করে সে দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল শক্ত করলে। যাহোক, আপাতত সে মনোভাব গোপন করাই স্থির করলে। পরে দেখা যাবে কি হয়।

হাতমুখ ধুয়ে নিজের কামরায় এসে কাপড়-জামা বদলে সঞ্জীব তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললে। তার কামিজ ইত্যাদি অধোবাসগুলো ময়লা ও ঘর্মাক্ত হয়ে তাকে এতক্ষণ পীড়া দিচ্ছিল। খানিক পরে হেঙ্গলার এসে তাকে জাহাজের অফিসরদের খানা-কামরায় নিয়ে গেল। খাবার দেখতেই সে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল। সে রুটিতে মাখন লাগাবার উদ্যোগ করতেই হেঙ্গলার বাধা দিয়ে বলল, "না রায়, মাখন, জ্যাম বা অন্য মিষ্টি খাওয়া তোমার বন্ধ। এখন থেকেই খাওয়ার সম্বন্ধে তোমাকে উচিত নিয়ম মেনে চলতে হবে।" হেঙ্গলারের হুকুমের স্বর, যেন সঞ্জীব তার ক্রীতদাস বা আসবাব হয়ে গেছে।

গার্ল্যাণ্ড কখনও কখনও তাকে মিষ্টি, মাখন খেতে নিষেধ করত বটে, কিন্তু কোনদিন তার কারণটা বলে দেয়নি। বা সে বিষয়ে কোন কড়া নিয়মেরও প্রবর্তন করেনি। সঞ্জীব বিরক্ত হয়ে হেঙ্গলারকে জিজ্ঞাসা করলে, "তাহলে খাব কি ?"

হেঙ্গলার ভোজনে রত ছিল। সে টেবিল থেকে একটা ছোট ন্যাপকিন নিয়ে মুখ মুছে বললে, "দুধ, রুটি, প্রচুর ফল; খাবার ভাবনা কি?"

দুধের ওপর সঞ্জীবের কোন কালেই টান ছিল না, বরং বিতৃষ্ণা ছিল। তা ছাড়া হেঙ্গলারের হুকুম তার ভাল লাগল না। সে হেঙ্গলারের দিকে চেয়ে বললে, "তোমার কথা আমি মানছিনে; আমি দুগ্ধপোষ্য শিশু নই। খেতে হয় আমি নিজের খুশিতে খাব।"

জাপানী অফিসরেরা নীরবে তাদের দু'জনের পানে চেয়ে রইল।

সঞ্জীবের কথার উত্তরে হেঙ্গলার নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে জ্যাম, মাখন ইত্যাদির পাত্রগুলো সরিয়ে নিয়ে দুধের পেয়ালা আগিয়ে দিলে। সঞ্জীবের তখন খিধেয় পেট জ্বলছে, সে খাওয়ার ওপর রাগ করতে পারলে না। হেঙ্গলারের নির্দেশ অনুযায়ী খেতে লাগল। তাদের এই প্রথম সংঘর্ষণে হেঙ্গলারেরই জিত হল।

চার

প্রথম রাত্রিতে হেঙ্গলার সঞ্জীবের কামরায় শুয়েছিল, তারপর তার শয্যার মত সে-ও প্রায় অদৃশ্য হল। দিন-রাত্রির মধ্যে হেঙ্গলার খানিকটা বাঁধাধরা সময়ে তার সঙ্গে থাকত, সঞ্জীবের সময় কাটাবার জন্য সে তাকে মুষ্টিযুদ্ধের নানা বই, পত্রিকা ও সাধারণ খানকয়েক উপন্যাস দিয়েছিল। খোলা সমুদ্রের হাওয়ায় দেখতে দেখতে সঞ্জীবের

মাথার ব্যথা ও দেহের গ্লানিটা চলে গেল। দিন দু'তিন এক রকম নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাটিয়ে একদিন প্রভাতে সঞ্জীব ডেকের ওপর পায়চারি করছিল, হঠাৎ এক জায়গায় একটা জাপানী নাবিককে দেখে তার সঙ্গে আলাপ করবার অদম্য ইচ্ছা হল। কাঁহাতক আর মানুষ মুখ বুজিয়ে থাকতে পারে! নানা বই পড়ে সে দু'চারটে জাপানী কথা কুড়িয়ে পেয়েছিল, একটু এগিয়ে গিয়ে সেই লোকটাকে বললে, "ও হায়ো গজাইমাশ।" বাক্যটা সুপ্রভাতজ্ঞাপক, ইংরেজী গুড মর্নিং-এর মত। নাবিকটা আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে মৃদুস্বরে প্রত্যভিবাদন করলে, "গজাইমাশ।" তারপর দ্রুত ভাষায় কি একটা বলে গেল। সঞ্জীব তার কথার একবর্ণও না বুঝতে পেরে আত্মপরিচয় দেবার হিসেবে বললে, "ওয়াটাকুশি ইণ্ডিয়া জিন" —আমি একজন ভারতবাসী। নাবিকটা তার চেপটা গোল মুখে একটু হাসি মাখিয়ে আবার গড়গড় করে কি বলে গেল; তার অনেকগুলো শব্দ ভাঙা বিকৃত বাংলা বলে মনে হলেও সঞ্জীব তার কোন অর্থ বোধ করতে পারলে না। হঠাৎ তার মনে হল যে বিদেশী নাবিকদের চাটগাঁয়ের লশকরদের যথেষ্ট সাহচর্য মিলে থাকে। হয়ত এই জাপানীটার ভাষা সেই লশকরদেরই ভাষা এবং এ জাহাজটায় হয়ত দু'চারজন চট্টগ্রামের লোক থাকতে পারে। উৎসাহিত হয়ে সঞ্জীব তখন ভাবতেও পারলে না যে তার কানপুরে জন্ম-কর্ম, সে খাঁটি বাংলা ভাষাটাই ভাল করে বোঝে না, তা চাটগেঁয়ে বাংলা বুঝবে কি! নাবিকটা তখন ডেক বুরুশ করার কাজে ব্যস্ত ছিল। সোজা বাংলা কথায় সঞ্জীব তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "জাহাজটায় কোন লশকর আছে কি?" তৎক্ষণাৎ তার পেছন দিক্ থেকে ইংরেজীতে উত্তর এল, "না, নেই কোন লশকর।" ঘাড় ফিরিয়ে সঞ্জীব দেখলে যে তার

পিছনে হেঙ্গলার দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার প্রশ্নের "লশকর" কথাটা বুঝে হেঙ্গলারই একটা আন্দাজী উত্তর দিয়েছে।

হেঙ্গলার বললে, "এ তোমার কথার খেলাপ করা, রায়। তোমাকে আমি কারও সঙ্গে কথা কইতে নিষেধ করেছিলুম। কাজটা আপত্তিকর।"

সঞ্জীব জ্বলে উঠে উত্তর দিলে, "তোমাকে আমি কথা দিলুম কবে, যে কথা রাখলুম না? আমি তোমার তাঁবেদার নই!"

হেঙ্গলার তার কাঁধে হাত রেখে বললে, "কেন মিছে ঝগড়া করছ, রায়? ঝগড়া বাধিয়ে তোমার সুবিধা হবে না। তোমার ছেলে-মানুষী গোঁ-টা ছাড়ো।"

সঞ্জীব কাঁধ নীচু করে হেঙ্গলারের হাত সরিয়ে দূরে সরে যেতে যেতে বললে, "Do your worse! যা খুশি তোমার করতে পার। আমি তোমার কোন কথা শুনব তা ভুলেও মনে কোর না।"

হেঙ্গলার হঠাৎ শিস্ দিয়ে ওঠে, যেন বা ঘোর অবজ্ঞাভরে কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে উত্তর দিলে, "ছোকরা, আমার এই হাত দিয়ে আমি বাঘ-সিংহও বশ করে থাকি, তোমার একগুঁয়েমি সারাতে আমার দেরি লাগবে না।"

সঞ্জীব আর কোন কথা না বলে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে।

* * * *

সঞ্জীবের অন্তর্ধান হবার সংবাদটা পরদিন দুপুর বেলা অস্কার সার্কাসে প্রচারিত হল। ফোর্ট উইলিয়ামের কয়েকজন খেলুড়ে অফিসার সেদিন হার্মান ও সঞ্জীবকে কেল্লার গোরাদের এক ঘরোয়া

টুর্নামেণ্টের জন্য নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল। হার্মান এ-ধরনের নিমন্ত্রণ সাধারণতঃ নিত না। কিন্তু কতকটা সঞ্জীবের জন্য ও গার্ল্যাণ্ডের পীড়াপীড়িতে সে যেতে রাজী হল এবং অফিসারগুলির সঙ্গে কথা কইবার জন্য সঞ্জীবকে তার আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ডেকে পাঠালে। লোক ফিরে এসে যখন খবর দিলে যে সঞ্জীব রাত্রে সেখানে যায়নি, গার্ল্যাণ্ড ও হার্মার দু'জনে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল এবং অফিসারদের টেলিফোনে পাকা কথা দেবার কথা বলে তারা সঞ্জীবের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

তার নিখোঁজ হবার সঙ্গে কোন দুর্ঘটনার যোগ আছে ভেবে তারা দু'জন কলকাতার প্রধান প্রধান হাসপাতালে খোঁজ নিলে। সেখানে কোন খবর না পেয়ে তারা আরও উৎকণ্ঠিত হয়ে পুলিসে খবর দিলে। রেমার্ক ও গার্ল্যাণ্ড সঞ্জীবের জন্য তারাপদবাবুর কাছে সম্পূর্ণভাবে দায়ী ছিল। তাঁকে কি করে এমন বিশ্রী সংবাদটা দেওয়া যায় তা ভেবে তারা খুবই অস্থির হয়ে উঠল। অবশেষে কোন কূল-কিনারা না পেয়ে দু'জনে যুক্তি করে মস্ত এক টেলিগ্রামে তারাপদবাবুকে সব জানালে। তিনিও তার করে জানালেন যে যত টাকাই লাগুক না কেন সঞ্জীবকে উদ্ধার করা চাই-ই চাই। তাঁর কানপুরের বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। রেমার্ক ও গার্ল্যাণ্ডকে সাহায্য করবার জন্য সঞ্জীবের মেজ ভাই অভয় কলকাতায় এল এবং তাঁর খোঁজে কয়েকজন ডিটেকটিভ লাগান হল।

ডিটেকটিভেরা হাসপাতাল বা থানায় গেল না। কলকাতার যে সব মুষ্টিযোদ্ধারা সঞ্জীবের কাছে হেরেছিল তাদের পাকড়াও করে তারা খবর বার করলে যে একজন জার্মান ধনী তাদের সঞ্জীবের সঙ্গে লড়বার জন্য নিযুক্ত করত। একথা শুনতেই রেমার্ক লাফিয়ে উঠে

বললে, "এ তাহলে হেঙ্গলার ছাড়া আর কেউ নয়।" হোটেলে হোটেলে খবর নিতে জানা গেল যে যেদিন অস্কার সার্কাস কলকাতা আসে সেইদিন হেঙ্গলারও চৌরঙ্গীর একটা হোটেলে এসে ওঠে এবং সঞ্জীব যেদিন নিখোঁজ হয় সেই সন্ধ্যাতেই সে হোটেলের হিসেবপত্র চুকিয়ে দিয়ে গেছে।

রেমার্ক বললে, "হেঙ্গলার যখন গেছে, তখন সে ভারতবর্ষ ছেড়েই চলে গেছে। এই আন্দাজ করে তারা জাহাজের তল্লাশ করলে, সে রাত্রে কোন্ কোন্ জাহাজ কলকাতার বন্দর ছেড়ে গেছে। তারপর দেখা গেল যে একটা জাপানী কার্গো বোটে তারা গেছে মালয়ের দিকে। কার্গো বোট হলেও তাতে কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর স্থান ছিল। সেটার যাত্রীর তালিকায় শুধু হেঙ্গলার ও সঞ্জীবের নাম আছে। পালিয়ে যাবার কয়েকদিন আগে থেকে হেঙ্গলার সে জাহাজটায় দুটো বার্থ নিয়ে রেখেছিল। বেশ বোঝা গেল যে ওই দিন, ওই সময়ে সঞ্জীবকে যে-কোন উপায়ে লোপাট করার বিষয়ে হেঙ্গলার কৃতসংকল্প হয়েছিল।

সার্কাসের মালিক অস্কার ও রেমার্ক হেঙ্গলার সার্কাসের গতিবিধি কতকটা জানত। মালয়, সিঙ্গাপুর, ইন্দোচীন, হংকং, ফিলিপাইন দ্বীপ ইত্যাদিতে সেবার হেঙ্গলার সার্কাসের খেলা দেখাবার কথা। অভয় ও গার্ল্যাণ্ড মালয় যাবার জন্য প্রস্তুত হল, কিন্তু রেমার্ক যাবার জন্য ব্যগ্র হলেও অস্কার তাকে ছুটি দিতে সম্মত হল না। অনেক অনুরোধের পর সে বললে যে তার সার্কাস কয়েকদিন পরে যখন বার্মা যাবে তখন সে রেমার্ককে কিছুদিনের ছুটি দিতে পারে।

কিন্তু মালয় যাত্রী জাহাজ পেতে তাদের কয়েকদিন দেরি হয়ে গেল। যখন তারা কলকাতা থেকে রওনা হল তখন হেঙ্গলার ও সঞ্জীব দশদিনের পথ এগিয়ে গেছে।

হেঙ্গলার চালাক লোক। সঞ্জীবকে নিয়ে একদিনের জন্য সেলাঙ্গরে নেমে, তার সার্কাসের ম্যানেজারকে নানা হুকুম পরামর্শ দিয়ে সে একেবারে সিঙ্গাপুরে গিয়ে হাজির হল। সে মনে মনে আঁচ করেছিল যে তাদের অনুসরণ করে রেমার্কের বা সঞ্জীবের বাড়ির কারও আসা বিচিত্র নয়। তারা গোপনে সেলাঙ্গরে গিয়েছিল, অনুসরণকারী কেউ এলে তাদের খবরও জানবে না, বিশেষ যখন সে দেখবে যে রাতের পর রাত হেঙ্গলার সার্কাসের নিয়ম মাফিক খেলা চলছে, হেঙ্গলার সেখানে উপস্থিত না থাকলেও তার কোন ব্যতিক্রম হচ্ছে না।

সিঙ্গাপুরে নিউ ওয়ার্ল্ড নামে কুস্তি বক্সিং-এর মত প্রতিযোগিতা-মূলক খেলার একটা পাকা আড্ডা আছে। তাতে কিন্তু বেশী করে মুষ্টিযুদ্ধের দঙ্গল হয়ে থাকে। তার কারণ সেখানকার চীনে অধিবাসীরা মুষ্টিযুদ্ধের ভারী ভক্ত। তারা মুষ্টিযুদ্ধ করতে যেমন, দেখতেও তেমনি ভালবাসে এবং দেখবার জন্য দিল-দরিয়া হয়ে পয়সাও খরচ করে। বেশ মোটা বাজির টাকা পাওয়া যায় বলে নানা দেশের, নানা জাতির মুষ্টিযোদ্ধারা সিঙ্গাপুরে লড়তে আসে।

সঞ্জীবকে নিউ ওয়ার্ল্ড-এ ভিড়িয়ে দিয়ে আবার পরীক্ষা করা এবং পরোক্ষভাবে তাকে পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধে পাকা করে নেওয়া হেঙ্গলারের মতলব ছিল। সঞ্জীব মনে মনে ঠিক করেছিল যে মন খুলে না লড়ে সে হেঙ্গলারের বিরুদ্ধাচরণ করে তাকে জব্দ করবে।

কিন্তু হেঙ্গলার মানুষ বা জন্তু দুইয়েরই মন বেশ ভাল করে বুঝত। সে সঞ্জীবের জন্য একটা ছয় রাউণ্ডের ছোটখাট যুদ্ধ পাকা করে ফেললে। সে খবর পেয়ে সঞ্জীব আগুন হয়ে উঠল। সে হেঙ্গলারকে বললে, "লড়তে হয় তুমি লড়োগে যাও, আমি প্রাণ গেলেও লড়ছিনে।"

সঞ্জীব যে সহজে লড়তে রাজী হবে না সে কথা হেঙ্গলার বেশ জানত। কিন্তু এ কথাও বেশ জানত যে, যে একবার লড়বার উন্মাদনা উপভোগ করেছে, যার খ্যাতির সাধ আছে সে কখন হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না; একটু তাতালেই সে লড়ার নামে তেতে ওঠে। সে চালাকি করে সঞ্জীবকে একটুও খোশামোদ না করে তার প্রতিপক্ষ চিয়া বক্ গী'র অজস্র সুখ্যাতি করতে লাগল। সে বললে, "বক্ গী সাধারণ লড়িয়ে নয়। তাকে আজ পর্যন্ত কেউ হারাতে পারেনি, বরং ব্রিটিশ নেভি'র ব্লেক, সিলোনের পেরেরা, বোম্বাইয়ের কূপারের মত বিচক্ষণ মুষ্টিযোদ্ধারা তার কাছে বেদম হার হেরেছে। ফিলিপাইনের অমন যে পাঞ্জো ডিলা, তার বড় ভাই এবং মুষ্টিযুদ্ধের সাথী অ্যালেক ডিলা বক্ গী'র সঙ্গে কায়-ক্লেশে সমান-সমান হয়েছে।" এই রকম নানা কথা বলে সে সঞ্জীবকে উত্তেজিত করলে। শেষে উঠে যাবার সময় টিপ্পনী করে গেল, "ভালই হল, রায়, যে তুমি লড়বে না। লড়লে যে একটা পাকও তার কাছে টিকে থাকবে তা আমি মনেও করি না। আমি কেবল তোমাকে একজন ভাল লোকের সঙ্গে লড়বার সুযোগ করে দিতে চেয়েছিলুম।"

সঞ্জীবের মনে উচ্চাশার অন্ত ছিল না। নিউ ওয়ার্ল্ডের নাম তার অজানা নয়। সে জানত যে সেটা মুষ্টিযোদ্ধাদের তীর্থস্থান। আমেরিকার শিকাগোয় যেমন ম্যাসিডন স্কোয়ার গার্ডেনসের

আখড়ায় লড়া যার-তার ভাগ্যে হয় না, প্রাচ্যের এ নিউ ওয়ার্ল্ডে লড়তে পাওয়াও তেমনি সৌভাগ্যের কথা। সেখানে গিয়ে লড়ার সঞ্জীবের একটা বড় সাধ ছিল। সে রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার কল্পনা উদ্দাম হয়ে উঠল। সিঙ্গাপুরের সব সুযোগ তার হাতের কাছে। তার মনে ও দেহে শক্তি ও পটুত্বের প্রখর অনুভূতি। তার ওপর সম্প্রতি সে রেমার্কের শিক্ষকতায় অনেক শিখেছে অনেক উন্নতি করেছে। বক্ গী'র মত প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ করে সে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করবে না-ই বা কেন? সে অনুভব করতে লাগল যে রেমার্ক তাকে দুর্ধর্ষ অজেয় করে দিয়েছে। যত সে এই সব ভাবে তত তার মন দৃঢ় হয়ে ওঠে। হেঙ্গলার ওস্তাদ লোক, সে ঠিকই বুঝেছিল যে শক্তিমানের সম্মান-স্পৃহাটাকে নাড়া দেওয়ার চেয়ে আর কিছু দিয়ে তাকে অধিকতর উত্তেজিত করা যায় না।

পরদিন সকালে হেঙ্গলারের সঙ্গে দেখা হতেই সঞ্জীব বললে, "আমি বক্ গী'র সঙ্গে লড়ব, তুমি সব ঠিক কর।"

হেঙ্গলার উৎসাহিত হয়ে সজোরে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললে, "সাবাস, রায়! এই তো চাই! একেই বলে সুবুদ্ধি! তুমি যদি চীনেটাকে হারাতে পার, আমি তোমাকে হাজার টাকা উপহার দেব।"

পাঁচ

খেলার ব্যবস্থা করার ওস্তাদ হেঙ্গলার তখন ঝকমকে বিজ্ঞাপন দিয়ে সারা দেশটাকে ছেয়ে ফেললে। সঞ্জীবের নাম গোপন করে তার নূতন নামকরণ হল, 'ব্যাট্লিং কিড'। প্রকাশ হল যে তার

জন্মভূমি সিংহল দ্বীপে। বিজ্ঞাপন, খবরের কাগজ ইত্যাদিতে সঞ্জীবের ছবি ছাপা হল বটে, কিন্তু সে ছবিতে সঞ্জীবের মুখ একটা চোখ-ঢাকা মুখোস দিয়ে ঢাকা রইল। তাতে কেউ কিছু মনে করলে না, বরং লোকে এই মনে করে উত্তেজিত হয়ে উঠল যে, এই নূতন লড়িয়ে ছোকরা বড় ঘরানার ছেলে, সে নিজের পরিচয় কারও কাছে দিতে চায় না। মুষ্টিযুদ্ধে বা খেলার অন্যান্য ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা অনেক বার ঘটেছে। অনেক সময় দেখাও গেছে যে যারা এমন করে আত্মগোপন করে লড়ে তারা সত্যই এমন সমাজ ও শ্রেণীর মানুষ, যাদের পক্ষে পেশাদার মল্লের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে লড়াটা অতিশয় নিন্দার্হ। সঞ্জীবকে রহস্যময় করে তুলে হেঙ্গলার তার বেশ কদর বাড়িয়ে দিলে।

হেঙ্গলার অনেক চেষ্টা করেছিল যাতে সঞ্জীবের ছবি খবরের কাগজে ছাপা না হয়, কিন্তু অনেক ভেবেও সে অন্য কোন উপায় খুঁজে পেলে না, কারণ লড়িয়েদের ছবি না ছাপা হলে দর্শকদের আকর্ষণ করা অসম্ভব কথা। সিঙ্গাপুরের খবরের কাগজ ভারতবর্ষে যায় না, সেদিকে হেঙ্গলারের কোন ভয় ছিল না। কিন্তু মালয় দেশের সর্বত্র ওখানকার সংবাদপত্রগুলো ছড়িয়ে যায়। হেঙ্গলারের ভয় ছিল যে যদি কেউ তাদের অনুসরণ করে মালয়ে আসে তাহলে তারা এই খবরের কাগজ দিয়ে সঞ্জীবের সন্ধান পেয়ে যাবে। কাজেই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাতের ব্যাপারটা চুকিয়ে দিয়ে তার ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় সরে পড়বার মতলব ছিল। অবশ্য সঞ্জীব এ কথার কিছুই জানত না। হেঙ্গলার এই হিসেব করে এত কাণ্ড করেছিল যে, সঞ্জীব নামজাদা কাউকে হারালে এবং নিজের কৃতিত্বের দ্বারা কিছু মোটা রকম টাকা

রোজগার করলে সহজেই সে হেঙ্গলারের বশীভূত হয়ে যাবে; তখন আর কোন লুকোচুরি করবার বা সাবধান হবার কারণ থাকবে না।

হেঙ্গলার ইচ্ছা করলে সঞ্জীবের বিপক্ষে একটা বাজে প্রতিপক্ষ খাড়া করে তাকে ঠকাতে পারত, কিন্তু তাতে তার নিজের কোনই লাভ হত না! তার লক্ষ্যটা খুব বড়, সঞ্জীবকে দিয়ে রেমার্ককে খর্ব করা। বক্ গী সত্যই উঁচু দরের যোদ্ধা। হেঙ্গলার সঞ্জীবকে তার ক্ষমতার বিষয়ে অনেক প্রমাণ দিয়েছিল। অবশ্য সঞ্জীব যে তাকে হারাতে পারে সেটা হেঙ্গলারের আন্দাজ ও আশা। তার আন্দাজে খুব বেশী ভুল হবার কারণ ছিল না, কারণ হেঙ্গলার বিশেষজ্ঞের চোখ দিয়ে দু'জন যোদ্ধারই শক্তি নিরূপণ করেছিল। দুজনে যদি সমান-সমানও হয় তাহলেও সেটা সঞ্জীবের পক্ষে বেশ প্রশংসার কারণ।

সঞ্জীব দিনে দিনে এত উত্তেজিত হয়েছিল যে মুখ ঢাকা দিয়ে লড়বার প্রস্তাবেও সে কোনই আপত্তি করেনি। হেঙ্গলার তাকে হোটেলে নজরবন্দী করে রেখেছিল। উত্তেজনার বশে সে তার ঘরের দরজায় দু'জন রাক্ষুসে চেহারার মুলাটো রক্ষী দেখেও রাগ করেনি। সে যে বন্দী, এ কথা মনে পড়লেই সে মনে মনে বলত, "দাঁড়াও হেঙ্গলার সাহেব, আগে এ ব্যাপারটা চুকিয়ে নিই. তারপর তোমাকে বোঝাব যে তুমিই বা কত বড় জার্মান ঘুঘু আর আমিই বা কি ধরনের বাঙালীর বাচ্চা!"

ইওরোপীয় এবং নিগ্রো অথবা কোন অশ্বেত জাতির সংমিশ্রণে যে বিচিত্র একটা জাতির উৎপত্তি হয়েছে তাকে মুলাটো বলে। মুলাটোদের মাথায় ঘি নেই, তা না থাক তাদের অসাধারণ গায়ের

জোরের কিন্তু অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। সমুদ্রের কিনারায় অনেক বন্দরে ইওরোপীয় হোটেলে মদ বেচবার যে দোকান বা বার থাকে তাতে গোরা সৈনিক এবং বেশী করে গোরা নাবিক খালাসীদের আড্ডা হয়। অত্যাচার বা মাতলামি তারা করেই। হোটেলের মালিকেরা তাদের তাড়াতে পুলিসের সাহায্য আর কতই নিতে পারে, নিজেরাই মাইনে দিয়ে মাতাল খেদাবার লোক রাখে। এই তাড়ানে দরোয়ানগুলোর নাম "চাকার আউট" (Chucker out)। বেশ শক্ত কাজ। সাধারণত মুলাটো এবং নিগ্রোরা সে কাজটা করে। তারা প্রায় সকলেই আগে পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা এবং কুস্তিগীরের কাজ করে প্রৌঢ় বয়সে মদের আড্ডার তাড়ানে দরোয়ান হয়। সঞ্জীবকে আটকে রাখবার জন্য হেঙ্গলার দু'জন ভীমদর্শন মুলাটো দরোয়ান নিযুক্ত করেছিল। লোক দুটো বোধ করি কেবল তাদের হাত দিয়ে দুধ-কলা দিয়ে ভাত চটকাবার মত সঞ্জীবকে চটকে মেরে ফেলতে পারত। হেঙ্গলার সঞ্জীবের কাছে এসে বসলে মুলাটো দু'জন খাবার ছুটি পেত, নচেৎ তারা সকল সময়ে সঞ্জীবের ঘরের দরজায় পাহারায় বসে থাকত। এ কয়দিনে সে অবশ্য লোক দুটোর সঙ্গে কোন কথা কয়নি বা বিরুদ্ধাচরণ করবার চেষ্টা করেনি; তাদের বশ করবার কথাটা ওঠেই না, কারণ যা দিয়ে তাদের নিমেষে বশ করা যায় সেই টাকা নামের জিনিসটির একটা আধলাও সঞ্জীবের ছিল না। তবে এ কথা ঠিক যে সেই রাক্ষস দুটোকে দেখে তার মনে এক ফোঁটাও ভয় হয়নি। বরং সে মনে মনে বেশ জানত যে তাদের সঙ্গে তার হাতাহাতি হওয়াটা একটুও আশ্চর্য কথা নয়। কিন্তু গোড়ায় গোড়ায় সে হেঙ্গলারকে ভয় করত, তার ইস্পাতের রঙের চোখের দিকে চেয়ে

সে কথা কইতে পারত না। অবশেষে কিন্তু নিত্যকারের পরিচয়ে সঞ্জীবের হেঙ্গলারের ভয়টাও ভেঙে গিয়েছিল।

তাকে ধরে আনা ও বন্দী করে রাখার জন্য সঞ্জীবের হেঙ্গলারের ওপর রাগ। জার্মানটা তাকে যে রকম যত্ন করত তা অন্য রকমের পরিবেষ্টন হলে তার বিশেষভাবে খুশী হবার কারণ হত। কিন্তু হেঙ্গলারের এই একটি গুরুতর অপরাধের জন্য সঞ্জীব তার ভীষণ শত্রু হয়ে উঠেছিল ; সে হেঙ্গলারের কিছুমাত্র কোন গুণ দেখতে পেত না। হেঙ্গলার তার বিষয়ে যাই করুক না কেন সঞ্জীব ভাবত যে সে তার স্বার্থের জন্যই তা করছে।

হোটেলের একটা নির্জন পাঁচিল-ঘেরা উঠোনে সঞ্জীবের ব্যায়াম অভ্যাস করবার একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা হয়েছিল। সকাল বেলায় হেঙ্গলার স্বয়ং এবং মুলাটো দু'জন সঞ্জীবকে সঙ্গে করে সেখানে নিয়ে গিয়ে জো নামের এক অতিকায় নিগ্রো ওস্তাদের হাতে সমর্পণ করত। জো'র মত শিক্ষক সিঙ্গাপুর কেন, বোধ করি আমেরিকাতেও ছিল না। জো চিরস্মরণীয় মুষ্টিযুদ্ধের নিগ্রো গুরু হ্যারি উইল্‌সের চেলা। ভুবনবিখ্যাত জ্যাক জন্‌সন্, জো জিনেট, স্যাম ল্যাঙ্‌ফোর্ড প্রভৃতি অতুলনীয় নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধারা ছিল তার গুরুভাই। সঞ্জীব তার সঙ্গে লড়তে লড়তে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেত। গার্ল্যাণ্ড তো কোন্ ছার! সঞ্জীবের মনে হত যে রেমার্কও জো'র কড়ে আঙুলের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

সঞ্জীবকে ভাল লড়তে দেখলে, বা তার ঘুষি নির্ভুল হলে সেটা হজম করে জো তার হলুদবরণ দাঁতগুলি বার করে ক্ষিপ্র নিশ্বাসের সহিত বলত, "রাহ্।" অর্থাৎ শাবাশ! ঘুষি বা পাঁয়তাড়ার দোষ দেখলে সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলত, "ট্যু ব্যাড গাড্‌নর!" কিন্তু সে রাহ্

কথাটাই বলত বেশী। আশ্চর্য ওস্তাদ জো! সে নিজে সঞ্জীবকে যখন প্রহার করত তখন তার প্রচণ্ড ঘুষির গতি সঞ্জীবের গা ছোঁবার আগেই মন্থর হয়ে যেত। যেন হাতুড়ির ঘা তুলোর তুলি হয়ে গায়ে বুলিয়ে গেল! যেন আমাদের দেশের ওস্তাদ বাগ্দী লাঠিয়ালের খড়ি-মাখান লাঠির ঘা, গায়ে লাঠি ছুঁল না, কেবল খড়ি দাগ দিয়ে গেল। জো'র নিজের হাত ও পেশীর ওপর তেমনি সূক্ষ্ম কর্তৃত্ব। সে সঞ্জীবকে কখনও জোরে আঘাত করত না, পাছে চোট লেগে সে আসল যুদ্ধের সময়ে অকর্মণ্য হয়ে যায়। সঞ্জীব পূর্ণ বেগে ও নিজের দেহের সম্পূর্ণ ভার দিয়ে প্রহার করলেও জো'র লোহার শরীরে কোন প্রভাবই হত না। সে খুশী হয়ে কেবল রাহ্ রাহ্ করত! সঞ্জীব তো জো'কে ভালবেসে ফেলেছিল, তার জো'কে কানপুরে নিয়ে যাবার ইচ্ছা করত। তার জো'র সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা তখন সফল হয়নি, কারণ হেঙ্গলারের হুকুমে কেউ সঞ্জীবের সঙ্গে কথা কইত না। কিন্তু সঞ্জীব বা হেঙ্গলার কেউই বুঝতে পারেনি যে জো তার মোটা বুদ্ধি দিয়েও তাদের দু'জনের সম্বন্ধটার কতকটা আন্দাজ করে নিয়েছিল এবং শিক্ষক যেমন মনের মত ভাল কোন ছাত্রকে ভালবাসে এই নিগ্রো ওস্তাদ তেমনি সঞ্জীবকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছিল।

কিন্তু এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও একদিন তাদের দু'জনের আলাপের সুযোগ হয়ে গেল। মুলাটো দু'জন কোনদিনই হেঙ্গলারের কাছাকাছি থাকত না, উঠানের এক কোণে বসে তারা সিগারেট টানত। সেদিন সকালে সঞ্জীব ও জো সবেমাত্র পাঁয়তাড়া আরম্ভ করেছে, এমন সময়ে উঠানের বন্ধ দরজাটায় কে ঘা দিলে। হেঙ্গলার নিজে দরজা খুলে দিতে হোটেলের একটা চাকর তার হাতে একটা টেলিগ্রাম দিলে।

"এখনি আসছি" বলে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে হেঙ্গলার চলে গেল। সঞ্জীব আর তখন নিজেকে সংবরণ করতে পারল না। মুলাটো দু'জনকে ঠকাবার জন্য সে লড়বার অভিনয় করতে করতে জো'কে চাপা গলায় এক নিশ্বাসে নিজের কথাটা সংক্ষেপে বলে গেল। আর বললে যে জো যদি তাকে পালিয়ে যাবার সাহায্য করে তাহলে তাকে সঞ্জীব নিজের বাড়ি নিয়ে যাবে এবং যত টাকা সে চায়, দেবে। জো এক কথায় তাকে সাহায্য করতে রাজী হয়ে গেল। ইতিমধ্যে হেঙ্গলার ফিরে এল, এবং সে কাছাকাছি আসার পূর্বেই জো এক ঘুষিতে অসতর্ক সঞ্জীবকে ভূপাতিত করলে। তারপর হেঙ্গলার যাতে শুনতে পায় এমন স্বরে বললে, "তোমার ডান পা-টা ভয়ানক মচকে গেছে যে!" মাটিতে পড়বার মুহূর্তে সঞ্জীব ভেবেছিল যে জো তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলে। কিন্তু পা মচ্‌কানর ভাঁওতার কথা শুনে সে তখন বুঝে নিলে যে এর ভেতরে নিশ্চয়ই কোন গভীর মতলব আছে। জো সঞ্জীবের বুট জুতো ও মোজা খুলে নিয়ে পা মালিশ করে দেবার অভিনয় করলে। শেষ পর্যন্ত সঞ্জীব তার কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দোতলায় নিজের ঘরে গেল।

জো'র উপদেশ মত সঞ্জীব বিছানায় শুয়ে পড়ল। সঞ্জীবকে খোঁড়াতে দেখে হেঙ্গলার অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছিল। জো তাকে বললে, "ভাববার কিছু নেই। সঞ্জীব খানিক শুয়ে থাক। আমি খানিক মালিশ করে তার পা-টা ঠিক করে দেব, দু'তিন ঘণ্টায় সম্পূর্ণ সেরে যাবে।" হেঙ্গলারের তখন একটা ব্যস্তভাব ছিল। সে জো'কে ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। জো জানত যে, দুপুরবেলাটা হেঙ্গলার নানা কাজে ব্যস্ত থাকে। তখন যদি সে সঞ্জীবের পরিচর্যা

করে, হেঙ্গলার নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে আসবে না। হেঙ্গলার জো'র কথা না শুনে যাবেই বা কোথা! তার পরদিন সঞ্জীবকে লড়তে হবে, তাড়াতাড়ি তাকে সুস্থ করে তুলতেই হবে। হেঙ্গলার জো'র চালাকিটা ধরতে পারলে না। এই নির্মম নিগ্রোটার যে সঞ্জীবের প্রতি কোন সহানুভূতি হবে, এমন কথা হেঙ্গলার ভাবতেও পারলে না। তার দরকার টাকা, হেঙ্গলার তা জো'কে দরাজ হাতেই দিয়েছে। কোন বিশ্বাসঘাতকতার কথা দূরে থাক, হেঙ্গলার ভেবে রেখেছিল যে, সঞ্জীব যদি পালাবার চেষ্টা করে অথবা তার কোন লোক এসে তাকে উদ্ধার করতে চায়, সে বাধা দেবার জন্য জো'কে নিজের কাজে লাগাবে।

দুপুরবেলা জো হেঙ্গলারের ঘরে গিয়ে দেখলে যে, সে অনেক টেলিগ্রাম লেখায় ব্যস্ত। মাথা তুলে হেঙ্গলার বললে, "আমি এখনই বেরিয়ে যাব, তুমি রায়ের সেবা করগে যাও। আজই তার পা ঠিক করে দিও।" একটু পরে সে কাগজপত্র ব্যাগে পুরে মোটরগাড়ি চেপে বেরিয়ে গেল।

জো দোতলায় এসে দেখলে যে, মুলাটো দু'জন পাহারায় আসীন। হোটেলের এ দিকটা নির্জন বলে তাদের বিশ্রী চেহারা ও সন্দেহজনক অবস্থান কার চোখে পড়েনি। তাদের সঙ্গে খানিক হাত-পা চালিয়ে মোটা রসিকতা করে জো চাবি খুলে সঞ্জীবের ঘরে ঢুকল। তার হাতে মালিশের বোতল। তারপর ভেতর দিক্ থেকে দরজাটা বন্ধ হল। সঞ্জীব উৎসুক হয়ে তার আগমন প্রতীক্ষা করছিল, জো'কে দেখে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

হোটেলের চাকরবাকরেরা দরজার চাবির ফুটো দিয়ে ঘরের ভিতর সব কিছু দেখে থাকে। দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে ফুটো ঢাকা

দেবার জন্য জো নিজের কোটটা খুলে সেখানে টাঙিয়ে দিলে। সঞ্জীব বিছানায় উঠে বসেছিল। জো তার হলদে দাঁতগুলি আকর্ণ বিস্তৃত করে বললে, "কি খবর কিড? পা কেমন?" সঞ্জীব মোটেই ভাবপ্রবণ ছিল না, কিন্তু এই বন্ধনের অবস্থায় এতকাল পরে একজন সহৃদয় বন্ধু পেয়ে সে আর আত্মসংবরণ করতে পারলে না। বিছানা থেকে এক লাফে নেমে এসে জো'কে জড়িয়ে ধরলে; তার গলার কাছে একটা বেদনা ঠেলে উঠল। বোধ করি জো তা বুঝতে পারলে কিন্তু কিছু প্রকাশ না করে বাইরের মুলাটো দুটোকে শোনাবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "পায়ের ব্যথাটা একটু কমেছে নাকি?" প্রয়োজনবশে এই অল্প সময়ের ভেতর সঞ্জীবও অভিনয় করবার ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল, সে স্বরে যতদূর সম্ভব কাতরতা প্রকাশ করলে। ঘরের ভেতর থেকে মালিশের ওষুধের তীব্র উৎকট একটা গন্ধ ভেসে এল। দেয়ালে ঠেশ দিয়ে বসে মুলাটো দু'জন বেশ বুঝলে যে, ঘরের ভেতর ওস্তাদের হাতে ভীষণ মালিশের কাজ চলছে।

জো ফিসফিস করে বললে, "দেখ, পালাবার ব্যবস্থা তো সহজেই করতে পারি। কেবল কোথাও তোমার একদিনের জন্য আশ্রয় এবং কিছু টাকার দরকার, তা না হলে পালানোটা সার্থক হবে না। আমি তোমাকে লুকোতে পারিনে, আমার ঘরে অনেকের যাতায়াত, আর মুলাটো দু'জন আমার ঘরটা বেশ চেনে। এখনও অবশ্য হাতে খানিকটা সময় আছে, ইতিমধ্যে কি ঘটবে তা বলা যায় না। আচ্ছা, আশ্রয়ের কথাটা আমি ভেবে দেখি। কিন্তু টাকার কি হবে? তোমার কাছে আছে নাকি কিছু?"

সঞ্জীব উত্তর দিলে, "একটা পয়সাও নেই। তবে হেঙ্গলার বলেছে যে, আমি জিততে পারলে টিকিট বিক্রির টাকার অংশ ছাড়া আমাকে কিছু বকশিশও দেবে। সেইটে যদি সফল হয়।"

জো বললে, "নিশ্চয়ই হবে। আমি বক্ গী-কে লড়িয়েছি। কিসে সে দুর্বল তা আমি বেশ জানি। অন্য সময় হলে অবশ্য তোমাকে এ কথা বলতুম না, কারণ সকলেই ওরা আমার চেলা, আমি তাদের শিক্ষা দিয়ে খাই। এখন কিন্তু অন্য কথা। বক্ গী'র বাঁ হাতটা যেমন ভয়ানক জোরাল, ডানটা তেমনি দুর্বল। তাছাড়া সে মোটেই ক্লিঞ্চ্ করতে, অর্থাৎ গায়ে গা দিতে চায় না; পারে না বলেই চায় না। তুমি যদি ক্লিঞ্চ্ করে বাঁ হাতে হাফ-আর্ম-জ্যাব চালাও, সে নির্ঘাত কাবু হবে। কিন্তু এ-ও বলে রাখছি, গী তোমাকে সহজে ক্লিঞ্চ্ করতে দেবে না। মনে রেখ যে, তার বাঁ হাতের পাল্লার ভেতর পড়লে তোমার নিজেকে বাঁচান আর তাকে সামলান মুশকিল হবে।

তবে তোমার গী-কে হারিয়ে দেবার খুবই আশা আছে। তোমার দৈর্ঘ্য আর বাহুবিস্তার গী'র চেয়ে বেশী, তোমার কায়দাতেও বিশেষ কোন দুর্বলতা নেই। ভড়কে না গেলে তুমি তাকে বেশ হারাতে পারবে। পারা চাই, না হলে টাকার অভাবে কিছুই হবে না। পালাতে গেলে টাকার চাকার ওপর বসে গড়গড় করে পালাতে হয়।" জো নিজের রসিকতায় হিহি করে হেসে উঠল। সঞ্জীবও হেসে ফেললে।

তারপর সঞ্জীব বললে, "আমি যে গী-কে হারাবার চেষ্টা প্রাণ দিয়ে করব সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার, জো! আগে ছিল শুধু

জয় করবার আকাঙ্ক্ষা। এখন তো তুমি বলছ যে, ওই জয় দিয়েই আমার পালাবার পথ তৈরী হবে!"

"কতকটা তাই, যদি আমার হিসাবের কোথাও গোলমাল না হয়ে যায়।" জো উত্তর দিলে।

হেঙ্গলার যখন সঞ্জীবের ঘরে এল, জো তখন একটা আরাম-কেদারায় পড়ে হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। ঘরটায় মালিশের ওষুধের চড়া গন্ধ ভরভর করছে, সঞ্জীবও তন্দ্রাচ্ছন্ন। আগেই জো দরজার ছিটকিনি খুলে রেখেছিল, তার কোটটা তার গায়ে।

সঞ্জীবের পায়ে আর ব্যথা নেই শুনে বিন্দুমাত্র কিছু সন্দেহ না করে হেঙ্গলার বাস্তবিকই খুশী হল। হয়ত কোন কারণে তার মন প্রফুল্ল ছিল; সে হঠাৎ সঞ্জীবকে বললে, "আজ বিকেলে আর কাল সকালে তো তোমার ব্যায়াম বন্ধ! চল, আজ এই হোটেলের সিনেমা-ঘরে তোমাকে ছবি দেখিয়ে আনি। অবশ্য তোমাকে কথা দিতে হবে যে, কারও সঙ্গে তুমি কথা কইবে না বা কোন চেঁচামেচি করবে না। আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে চাই।" সঞ্জীব কথা দিলে। আগে সে সুযোগ পেলে এই ধরনের একটা কাণ্ড করে জনসাধারণের বা পুলিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে ভেবেছিল। এখন বক্ গী'র সঙ্গে লড়বার উৎসাহে সঞ্জীব সে মতলবটা আপাতত চাপা দিলে।

হোটেলটার অন্য একটা বাড়িতে সিনেমা হল। কোন প্রহরী না নিয়ে সাহস করে হেঙ্গলার সঞ্জীবকে সেখানে নিয়ে গেল। অবশ্য জো তাদের সঙ্গে রইল। জো'র ঠিক পাশে ইংরেজী কাপড়-পরা এক ভদ্রলোক বসে, তার বাঁদিকে শাড়ী-পরা একটি যুবতী মেয়ে, তার শাড়ী বাঙালী, সেটা পরার ধরন বাঙালী, চুল-বাঁধা বাঙালী, মুখেও

তার বাঙালী ছাঁদ আর লাবণ্য। সঞ্জীব তাকে দেখে শুধু আশ্চর্য হল না, তার গায়ে কাঁটা দিলে। সিনেমা আরম্ভ হতে আলো নিভল। তারা কি ভাষায় কথা বলে তাই শোনবার জন্য সে ছবির দিকে মন না দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইল। তার মনে পলায়ন সংক্রান্ত নানা ভাবনা তোলপাড় করতে লাগল।

সঞ্জীব কান পেতেই ছিল। অল্পক্ষণ পরে সে শুনতে পেলে যে, মেয়েটি তার পাশের লোকটির সঙ্গে বাংলা ভাষাতেই ছবিটার কথা বলছে। অনেক দিন পরে মাতৃভাষা শুনে, অথবা স্বজাতির সান্নিধ্যে, কিংবা পালাবার বিষয়ে সাহায্য পাবার সম্ভাবনার কথা মনে করে সঞ্জীব অত্যন্ত উৎসাহিত ও চঞ্চল হয়ে উঠল। তার প্রবল ইচ্ছা হল যে, তখনই সে দু'জনের সঙ্গে আলাপ করে কিন্তু স্থান-কাল-অবস্থা ভেবে সে ইচ্ছাটা সে নিরোধ করলে।

সিনেমার মাঝের বিরামের সময় একজন চীনা ভদ্রলোক সেই লোকটিকে "মিস্টার গুহ" বলে সম্ভাষণ করে একটা মকদ্দমা সম্বন্ধে দু'চারটে কথা কইলে। উকিলের ছেলে সঞ্জীব বুঝলে যে ভদ্রলোকটি ব্যারিস্টার, আর বাঙালী তো বটেই। তার জানা ছিল যে, সিঙ্গাপুর, মালয়, ব্যাঙ্কক্ এবং ওদিকে ব্রিটিশ ইস্ট আফ্রিকাতে কয়েকজন বাঙ্গালী ব্যারিস্টার আছেন। সঞ্জীবের মাথায় চিন্তা-সূত্রগুলোর জট পাকিয়ে গেল। অস্থির মন নিয়ে সে সে-রাত্রে ঘুমোতে পারলে না। সে সেই অচেনা মিস্টার গুহকে নিজের বিষয়ে একটা দীর্ঘচিঠি লিখে রাখলে। তাতে পরদিন নিউ ওয়ার্ল্ডে তার মুখ ঢাকা দিয়ে লড়বার কথা রইল।

পরদিন প্রভাতে জো তার কাছে এল। সঞ্জীব তার আশাতেই বসে ছিল। সে জো'কে সব বলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিঠিটা

গুহকে দেবার জন্য তাগিদ করলে। গুহ যদি সত্যই ব্যারিস্টার হয় তাহলে তাকে খুঁজে পাওয়া খুবই সহজ কথা।

অবনী গুহ সত্যই ব্যারিস্টার! জো'র হাতে সঞ্জীবের চিঠি পেয়ে সে খানিকক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইল। অবশেষে সে জো'কে বলে দিলে, "আমি রাত্রে নিউ ওয়ার্ল্ডে যাব। আমার দ্বারা কি হতে পারে তা সেখানে তোমাকে জানাব।" জো চলে গেল। কিন্তু অবনী যেন নিজেকে সঞ্জীবের জন্য দায়ী মনে করে অস্থির হয়ে উঠল। অবশেষে সে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে কানপুরে তারাপদ-বাবুকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলে। একবার তার মনে হল, পুলিসের কর্তাকে সঙ্গে নিয়ে সঞ্জীবকে উদ্ধার করে আনে। কিন্তু এই ভেবে তা করলে না যে, সিঙ্গাপুর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বদমায়েশদের আড্ডা; যদি সঞ্জীবের কারণে তাদের কেউ তার শত্রু হয়ে ওঠে তাহলে তার সিঙ্গাপুরে বসে ব্যারিস্টারি করা দূরে থাক, মান-সম্ভ্রম আর প্রাণ বাঁচানো কঠিন হবে। কিন্তু তাহলেও সে সঞ্জীবের আশ্রয়ভিক্ষা করাতে 'না' বলতে পারলে না, তাকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করতে কৃতসঙ্কল্প হল।

সে রাত্রে নিউ ওয়ার্ল্ড লোকে লোকারণ্য। একে বক্ গী সিঙ্গাপুরের আদৃত যোদ্ধা, তার ওপর তার প্রতিপক্ষ মুখ ঢেকে আর নাম গোপন করে লড়ছে। লোকে ভাবছে, না-জানি সে কে, আর কত বড় বীর! গোপনতা তার বীর্যটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। সে রাত্রে অন্য দু'চারটে প্রতিযোগিতা থাকলেও আসল যুদ্ধটা দেখবার জন্য দর্শকেরা উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল। দেখা গেল, অবনী গুহ ইংরেজী সান্ধ্য বেশ পরে লড়াইয়ের আঙ্গিনার ধারে সর্বোচ্চ দামের একটা আসনে বসে আছে। তার কামিজের পালিশ-করা সমুখটায় আলো

প্রতিফলিত হয়ে ঝকঝক করছে। জো সেখানে সর্বজন-পরিচিত, সকলেরই সে খুড়ো। সে ঘুরে ঘুরে নানা লোকের সঙ্গে কথা কয়ে গুহের কাছে গেল। গুহ তাকে বললে, "সঞ্জীবকে আশ্রয় দিতে আমি রাজী, তা আজই হোক আর কালই হোক। নিজের কোন ক্ষতি না করে তার জন্য আমি সব করতে প্রস্তুত আছি।"

জো সব শুনে বললে, "তাতেই হবে। কিন্তু আজ রাত থেকে আপনি ত'য়ের থাকবেন।"

নিউ 'ওয়াল্ডে'র একটা সাজ-ঘরে সঞ্জীব লড়বার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে ছিল। মুখোশের বাইরে তার মুখ যতটুকু দেখা যায় সেটা তখন উৎসাহে রক্তাভ। তার কাছেই হেঙ্গলার আর মুলাটো দু'জন বসে, জো সঞ্জীবকে দু'চারটে উপদেশের ও উৎসাহের কথা ছাড়া আর কিছু বলবার সুযোগ পেলে না। বাইরে থেকে তখন ঘুষির ধপধপ আওয়াজ আসছে। তারা কেউ আখড়ায় যুদ্ধ দেখতে উঠে গেল না।

এক সময়ে সে শব্দটা থামল এবং জনসমুদ্র কোলাহল করে উঠল। সঞ্জীব বুঝলে যে, বক্ গী আখড়ায় গিয়ে উঠেছে আর দর্শকেরা চেঁচামেচি করে তার সংবর্ধনা করছে। সেও বাইরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। এইবার জো তার দিকে চেয়ে হেসে বললে, "মনে থাকে যেন ভায়া, তোমাকে জিতে টাকা রোজগার করতে হবে। আমার বেশ মোটা রকমের বকশিশ চাই।" কথাটার সাদাসিধে মানে ধরে হেঙ্গলার হেসে উঠল। সঞ্জীব কিন্তু জো'র ইঙ্গিতটা বুঝলে।

প্রতিযোগিতার কর্মকর্তা দর্শকদের কাছে দুই প্রতিপক্ষের

যথাবিহিত পরিচয় দিলে। মুখোশের ভেতর দিয়ে সঞ্জীব বক্ গী-কে আপাদমস্তক ভাল করে দেখে আশ্বস্ত হল। তাকে সে যতটা দুর্ধর্ষ বলে ভেবেছিল ততটা বোধ হল না। তার দৃষ্টি বক্ গী'র দক্ষিণ অঙ্গে নিবদ্ধ হয়ে রইল। সে নিজেকে বিশ্বাস করালে যে, বক্ গী'র ডান দিকটা ঠুনকো কাঁচ দিয়ে তৈরী, ছোঁবামাত্র ঝনঝন করে চুরমার হয়ে ভেঙে পড়বে। সঞ্জীব মনে মনে গী-কে আক্রমণ করবার ধারা তৈরি করে নিয়েছিল। সে নিজে অবলীলায় চল্লিশ পাক লড়তে পারে, দু'পাকে তার দমের কিছুই যাবে না। অপর পক্ষে, জো'র কথা যদি ঠিক হয়, বক্ গী'র গায়ে গা না দেওয়া এবং নিকট পাল্লার মার খেতে না চাওয়ার মানে, নিশ্চয়ই তার দমের কোন গলদ আছে। তার সঙ্গে সমান-সমান হতে গেলে তাকে ক্রমাগত পাঁয়তারা করতে বাধ্য করলে গী'র আর দম থাকবে না, সে আপনিই কাবু হয়ে পড়বে। কিন্তু সঞ্জীবের চাই তাকে হারানো, সমান-সমান হবার আর কথা উঠে না।

কাজেই যুদ্ধ আরম্ভ হবার ক্ষণেই সঞ্জীব বক্ গী'র ওপর বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার বাঁ মুঠোটা গী'র কপাল স্পর্শ করলে বটে কিন্তু সে ওপর দিকে একটা হাঁটু গুটিয়ে তুলে সঞ্জীবকে অভ্যর্থনা করলে। এই অন্যায় আঘাতটার টাল সামলাতে না পেরে সঞ্জীব মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, এবং চতুর্দিকে 'ফাউল ফাউল' বলে চিৎকারধ্বনি হতে থাকল। রেফারী যখন গী'কে ফাউল করার জন্য সাবধান করে দিচ্ছিল, সঞ্জীব উঠে দাঁড়াল। তার দাড়ি থেঁতলে গিয়ে রক্তপাত হচ্ছিল, তাতে তার দেহ গরম হয়ে উঠল।

দ্বিতীয় পাকে বক্ গী তার সুবিখ্যাত বাঁ হাতের ঘুষি দিয়ে আক্রমণ করলে, আর সঞ্জীব নিজের দেহ নীচু করে একেবারে তার

বুকের সঙ্গে মিশে গেল। তারপর গী'র বাঁ হাতটা নিজের ডান বগলে চেপে ধরে বাঁ হাতে তার বুকের কড়ার ওপর, পাঁজরায় অবিশ্রাম ঘুষি-বৃষ্টি করতে লাগল। রেফারী তাদের ছাড়িয়ে দিতে সঞ্জীব দেখলে যে, বক্ গী'র চোখ দুটো ঠেলে বেরোবার উপক্রম হয়েছে, সে কামারের হাপরের মত হাঁপাচ্ছে আর তার হাঁটু দুটো থরথর করে কাঁপছে। সত্যিই বক্ গী'র একটুও শাস্তি সহ্য করবার ক্ষমতা ছিল না। সঞ্জীব তখন তাকে তাড়া করে ঘুষোতে ঘুষোতে আখড়ার ঘেরা দড়ির গায়ে ঠেসে ধরলে এবং ওজন-করা প্রচণ্ড ঘুষিতে ঘুষিতে তাকে ভূপাতিত করলে। নীচের ক্যাম্বিশের চাদরের ওপর বক্ গী উপুড় হয়ে পড়ে রইল। রেফারী হাত তুলিয়ে তুলিয়ে হেঁকে হেঁকে গুণতে লাগল এক দুই তিন চার—তার দশ গোনা শেষ হয়ে গেল। আরও কয়েক সেকেণ্ড পরে গী ওঠবার চেষ্টা করতে গেল কিন্তু আবার ঘুরে পাক খেয়ে মাটিতে পড়ল। তার মাথায় তখন কানামাছি খেলার মত পাকের ধাঁধা লেগেছে। জনতা সঞ্জীবের জয়ধ্বনি করে উঠল।

প্রচণ্ড কোলাহলের মাঝে তারা হোটেলে ফিরে এল। সঞ্জীবের এই অপ্রত্যাশিত বিজয়ে হেঙ্গলার সত্যই পরমানন্দ লাভ করেছিল। হয় সে বক্ গী-কে ভুল করে বাড়িয়েছিল, নয়তো সে সঞ্জীবের প্রকৃত ক্ষমতাটার আন্দাজ করতে পারেনি। এখন বুঝলে যে, রেমার্ক অকারণে সঞ্জীবকে ভালবাসেনি। সঞ্জীব জয়ের নেশায় অভিভূত হয়ে গাড়িতে বসে ছিল। জো গম্ভীর হয়ে কত কি ভাবছিল। তার মাথায় তখন ভাবনার চরকিপাক খেলছে।

ঘরে ঢুকেই হেঙ্গলার সঞ্জীবকে এক তাড়া নোট দেখিয়ে সেগুলো একটা বাক্সে পুরে চাবিটা নিজের পকেটে ফেললে, বললে, "এ আড়াই

হাজার টাকা তোমার বটে, কিন্তু বাক্সের চাবিটা আপাতত আমার কাছে রইল।”

জো'র চোখের গোপন ইশারায় সঞ্জীব বুঝলে যে এইবার যাত্রা করবার সময় এসেছে। বোধ হয় মুলাটো দুটোর চোখের আড়ালে টাকাটা বার করবার জন্য হেঙ্গলার ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল। বাইরে তখন তারা ছিল কি না কে জানে! এত কথা না ভেবে সঞ্জীব হঠাৎ হেঙ্গলারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার নাকে মুখে ঘুষি-বৃষ্টি করতে লাগল। হেঙ্গলার পিছু হাঁটতে হাঁটতে পকেটে হাত পুরে যে বস্তুটির বাঁট ধরতে গেল সেটা পকেটের বাইরে এলে আমাদের আর এ গল্পটা লিখতে হত না। জো ক্ষিপ্র হাতে হেঙ্গলারের হাত মুচড়ে রিভলভারটা কেড়ে নিলে, হেঙ্গলারও ধরাশায়ী হল। তখন তাকে পিছমোড়া করে ও তার মুখের ভেতর কাপড় গুঁজে বাঁধা সহজ হল। তার পকেট থেকে চাবিটা নিয়ে হেঙ্গলারকে তারা স্নানের ঘরের ভেতর ঠেলে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলে। সঞ্জীব টাকাগুলো জো'র জিম্মায় দিলে, তারপর তারা গরাদেহীন জানলা গলে আলিসার ওপর দাঁড়াল। জো পথ ঠিক করে রেখেছিল। বাড়িটার একটা লোহার গা-নল বেয়ে পাকা চোরের মত জো ক্ষিপ্রগতিতে ও সঞ্জীব সাবধানে আস্তে আস্তে হোটেলটার পিছন দিকে একটা অন্ধকার গলিতে নেমে গেল।

গলি ছাড়িয়ে একটা বড় রাস্তা। সেটা পার হয়ে এল আরও কয়েকটা অলিগলি। তারপর অবনী গুহের বাড়িতে সঞ্জীব আশ্রয় পেলে। সব ব্যবস্থা করে যথাসময়ে আসবে বলে জো নিঃশব্দে চলে গেল।
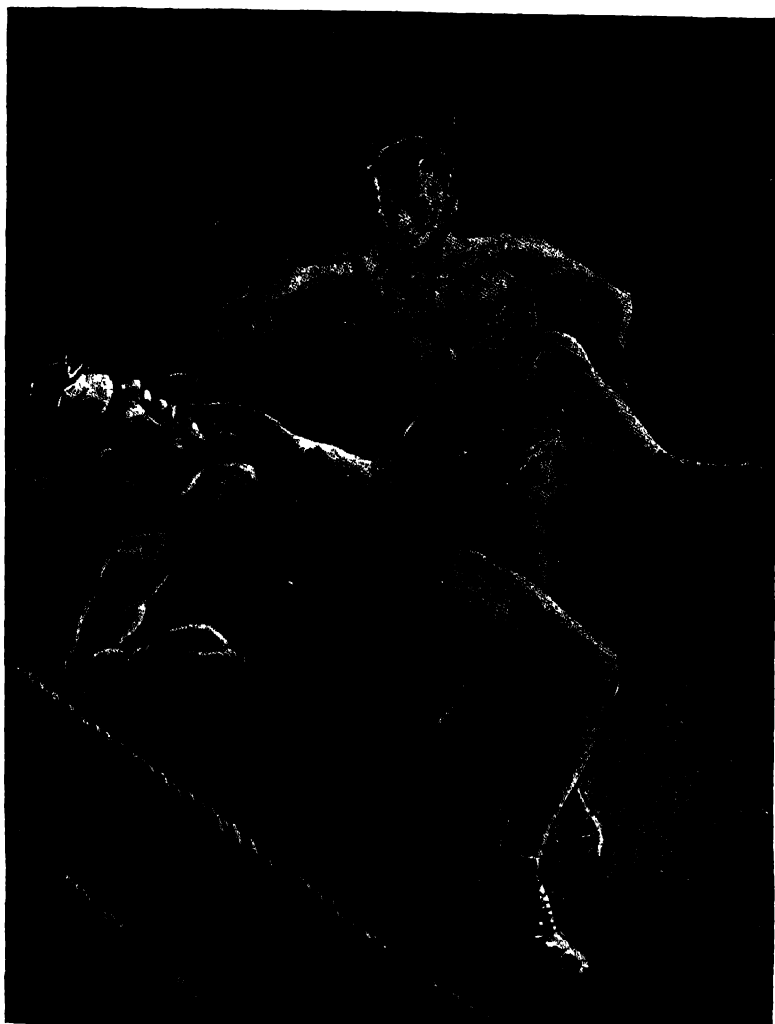
রেমার্ক পিছু সরতে সরতে একেবারে দড়ির ওপর গিয়ে পড়ল।

ছয়

রেমার্কের নির্দেশ অনুসারে সঞ্জীবের মেজদাদা অভয় ও গার্ল্যণ্ড সেলাঙ্গরে পৌঁছে হেঙ্গলার সার্কাসে গিয়ে অটো হেঙ্গলারের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে। সার্কাসের ম্যানেজার এমন ভাব দেখালে যেন সে আকাশ থেকে পড়েছে, পৃথিবীর কোন ঘটনার খবর তার জানা নেই। গার্ল্যণ্ড তাকে খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগল, শেষে সে তাকে পুলিসের ভয় দেখালে। ম্যানেজারও বার বার বললে, "আমি আপনাদের সত্যই বলছি যে আমাদের মালিক এখনও ভারতবর্ষ থেকে ফিরে আসেন নি, সেখানে তিনি নানা জরুরী কাজে আটকা পড়ে গেছেন। আর, তিনি কবে যে ফিরবেন তা-ও আমাদের জানা নেই। গার্ল্যণ্ডরা সার্কাস ছাড়া অন্য স্থানেও তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করলে, নানা স্থান থেকে খবর পেলে যে হেঙ্গলারকে কিছুদিন থেকে তার সার্কাসে দেখতে পাওয়া যায় নি তার সঙ্গে কোন ভারতীয় যুবককে দেখতে পাওয়া তো দূরের কথা!

হতাশ হয়ে তারা তারাপদবাবু ও রেমার্ককে খবর পাঠালে যে, হেঙ্গলার এখনও ভারতবর্ষে আছে, মালয়ে আসেনি। রেমার্ক কিন্তু সে কথাটা বিশ্বাস করলে না, সে জানালে যে হেঙ্গলার অতিশয় ধূর্ত লোক, এমন একটা কুকর্ম করে হঠাৎ নিজের আড্ডায় গিয়ে আত্ম-প্রকাশ করবার ছেলে সে নয়। তার মালয়ে আসা পর্যন্ত সে অভয় ও গার্ল্যণ্ডকে সেলাঙ্গরে অপেক্ষা করতে বললে। কিন্তু দু'জনে পরামর্শ

করে তারা সেলাঙ্গর ছেড়ে কুয়ালালামপুরে চলে গেল। কারণ আর কয়েকদিন পরেই হেঙ্গলার সার্কাসের সেখানে যাবার কথা, তারপর সেটা ফিলিপাইনের ম্যানিলা শহরের দিকে লম্বা পাড়ি দেবে।

হেঙ্গলারের ন্যাড়া মাথা রুশ ম্যানেজারটা দেখতে বোকা-সোকা হলেও আসলে তার মালিকের মতই ধূর্ত ছিল। সে সাংকেতিক কথায় টেলিগ্রাম করে সব খবর হেঙ্গলারকে জানাল। আমরা সে খবর পেয়ে হেঙ্গলারকে উদ্বিগ্ন হতে দেখেছি। তার পরামর্শ মত তার ম্যানেজার যেমন সাবধান হল, সে নিজেও তেমনি সদাসর্বদা সতর্ক হয়ে রইল। তবে এ কথাটা সে বেশ বুঝে নিলে যে, অভয়েরা যখন এত কাছাকাছি এসে পড়েছে, তখন সঞ্জীবের খবরটা তাদের কাছে আর বেশী দিন চাপা থাকবে না।

রেমার্কের অপেক্ষায় কুয়ালালামপুরে বসে অভয় ও গার্ল্যণ্ডের দিন ছটফট করে কাটতে লাগল। তাদের পূর্বগামী জাপানী জাহাজে হেঙ্গলার সঞ্জীবকে নিয়ে পালিয়েছে, কাজেই তারা এ দেশেই কোথাও আছে। কিন্তু মালয়ে যখন তার খবর পাওয়া গেল না তখন অভয় ধরে নিলে যে, ধূর্ত জার্মানটা আরও দূরে সরে গিয়ে তাদের চোখে ধুলো দিয়েছে। অনেক ভেবেচিন্তে সে ম্যানিলার আমেরিকান পুলিসকে সব বিবরণ দিয়ে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলে। আশ্চর্য এই যে, হেঙ্গলার যে সিঙ্গাপুরে লুকিয়ে থাকতে পারে, সে কথাটা অভয় বা গার্ল্যণ্ড কারও মনে পড়ল না।

উদ্বিগ্ন হয়ে তারা ম্যানিলা থেকে খবরের প্রত্যাশা করছে—এমন সময় এক কপি "সিঙ্গাপুর টাইম্‌স্‌" খবরের কাগজ গার্ল্যণ্ডের হাতে পড়ল। কাগজটা সঞ্জীবের মুষ্টিযুদ্ধের আগের দিনের। তাতে সঞ্জীব

আর বক্ গী'র বিবরণ ও ছবি ছিল। অভয় প্রথমে কাগজটা পড়েছিল কিন্তু তাতে মন দিতে পারেনি বলে সঞ্জীবের মুখোশ-পরা ছবিটা তার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। গার্ল্যাণ্ডের তাতে নজর পড়তেই সে লাফিয়ে উঠল, চিৎকার করে বললে, "এই তো সঞ্জীব! তার দেহের প্রত্যেকটা ইঞ্চি আমি চিনি। এই তো তার লড়বার ভঙ্গী! চোখে ঠুলি বেঁধে দিয়ে তো আর গোটা মানুষটাকে লুকানো যায় না!"

অভয়ও তখন সঞ্জীবকে চিনলে, কিন্তু মহা ভাবনায় পড়ে গেল। ভাবতে ভাবতে সে বললে, "তাই তো গার্ল্যাণ্ড, তাহলে দেখছি যে সেই জার্মান বদমায়েশটা সঞ্জীবকে বশ করে ফেলেছে! সঞ্জীব স্বেচ্ছায় এ সব না করলে জবরদস্তি করে তো আর কাউকে দিয়ে কিছু করানো যায় না!"

গার্ল্যাণ্ড বললে, "আপনি ভুল করছেন, মিস্টার রয়! একটা ছেলেমানুষকে ভয় দেখিয়ে বা লোভে ফেলে কিছু করিয়ে নেওয়া সে হারামজাদাটার পক্ষে বেশী কথা নয়।"

তৎক্ষণাৎ তারা সিঙ্গাপুর যাবার ঠিক করলে। রেমার্ককে সোজা সিঙ্গাপুরে আসবার জন্য খবর দেওয়া হল। এই সকল খবর যখন আদান-প্রদান করা হচ্ছে, তখন সঞ্জীবের সঙ্গে বক্ গী'র যুদ্ধটা শেষ হয়ে গেছে, সঞ্জীবও পলাতক। তারাপদবাবু অবনী গুহের তার পেয়ে এদেরও খবর দিলেন।

সাত

এখন থেকে এ গল্পটা হয়ত সিনেমাসুলভ গল্পের মত শোনাবে। কিন্তু আমাদের তা বর্ণনা করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। যেখানে

পলায়ন আর পশ্চাদ্ধাবন আছে, সেখানেই বুদ্ধির খেলা, শেয়ানায়-শেয়ানায় কোলাকুলি, লুকোচুরি, একের হাত থেকে অন্যের মুক্তি পাবার অথবা একজনের অন্য আর এক-জনকে ধরে রাখবার জন্য মারামারি ইত্যাদি শুধু বানানো গল্পে নয়, প্রকৃত জীবনেও অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। বলা বাহুল্য, এ রকম ঘটনা জীবনে ঘটে বলেই তা দিয়ে গল্প সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

স্নানের ঘরের ভেতর হেঙ্গলারের যখন জ্ঞান হল, তখন তার নিজেকে মুক্ত করবার অথবা চেঁচামেচি করবার কোনই উপায় নেই। তার জার্মান রক্ত ক্রোধে ফুটতে লাগল এই মনে করে যে, একটা দুগ্ধপোষ্য বালক তাকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিয়ে এই দশা ক'রে গেল। হেঙ্গলার দুর্বল ছিল না। কিন্তু তার এরকমভাবে জব্দ হবার কারণ, সে সেই মুষ্টিযুদ্ধের পর আনন্দ বেশী হয়েছিল বলে মনের স্ফূর্তিতে একটু বেশী করে মদ খেয়ে ফেলেছিল। সে সময়ে তার দেহ ছিল মাদক-বিবশ, সঞ্জীব তখন অতর্কিতভাবে তাকে আক্রমণ করেছিল। নিজেকে সামলে নেবার আগে সঞ্জীবের প্রচণ্ড ঘুষি বোধ করি তার চোয়াল ভেঙে দিয়ে তাকে অজ্ঞান করে দিয়েছিল।

জিভ নেড়ে নেড়ে মুখের কাপড়টা বাইরে ফেলার বৃথা প্রয়াস করতে গিয়ে হেঙ্গলারের জিভটা পাকা ফোড়ার মত বেদনায় টনটন করতে লাগল, কিন্তু কাপড়ের পুঁটলিটা একটুও নড়ল না। চোয়াল নাড়তে গিয়ে হেঙ্গলার বুঝলে যে সেটার অবস্থা মোটেই ভাল নয়, সঞ্জীব যেন তার চোয়ালটা থেঁতো করে দিয়ে গেছে। বাঁধা হাত দুটোও যখন অনেক টানাটানি করে খুলল না, তখন সে চুপচাপ করে

পড়ে থেকে সঞ্জীব এতক্ষণে কোন্ পথে কত দূরে পালিয়েছে তাই ভাবতে লাগল।

সঞ্জীব নিজের ঘরের ভেতরেই খাওয়া-দাওয়া করত। সেটা অবশ্য হেঙ্গলারেরই ব্যবস্থা। খানিক পরে হোটেলের খানসামা সঞ্জীবের জন্য খানা নিয়ে এল। সে সঞ্জীবকে না পেয়ে এবং বিশেষ করে ঘরটার এলোমেলো অবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। মুলাটো দু'জন একটু আগে স্বস্থানে ফিরে এসে ঝিমোচ্ছিল, খানসামাটা তাদের ঘরের ভেতর ডেকে নিয়ে গিয়ে সব দেখালে। এখান-ওখান দেখতে দেখতে অবশেষে তারা গুসলখানার দরজা খুলতেই হেঙ্গলারকে বন্দী অবস্থায় দেখে অবাক্ হয়ে গেল। বাঁধন খুলে দিতেই হেঙ্গলার উঠে এক মুঠো টাকা খানসামাটার হাতে দিয়ে নিজের ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল লম্বা করে রেখে তার নিজের মুখ বন্ধ করে রাখতে ইশারা করলে। তারপর আবার বকশিশের আশা দিয়ে তাকে ঘর থেকে ভাগালে।

জার্মানটা মুলাটো দু'জনকে অবস্থাটা তাড়াতাড়ি বর্ণনা করে বললে, "যত টাকাই লাগুক, সঞ্জীব আর জোঁ'কে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরা চাই। কিন্তু সব ব্যাপার যতদূর চুপিসাড়ে সম্ভব হওয়া চাই!" টাকার দ্বারা কি না হতে পারে! অবিলম্বে সেই দু'জন মুলাটো এবং আর জনতিনেক মুলাটো আর চীনা বদমাশ সঞ্জীবদের খুঁজতে লেগে গেল। খানিক সময় হেঙ্গলার নিপাট ভালমানুষটির মত হোটেলে থেকে চোয়ালে ওষুধ লাগাতে লাগল।

মুলাটো দরোয়ানদের একজন জো'র বাড়ি ছুটল। গিয়ে দেখলে যে, জো নিজের ঘরের সামনের সিঁড়িতে পা ছড়িয়ে বসে দিব্য মনের

সুখে গান ধরেছে আর মাঝে মাঝে বিয়রের বোতলে চুমুক দিচ্ছে। মুলাটোটা তাকে বাড়িতে এবং এ রকম বাহাল-তবিয়তে পেয়ে অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। সে সঞ্জীবের খবর জিজ্ঞাসা করতেই জো হিহি করে হেসে নিজের কাঁধের ওপর দিয়ে দরজার দিকে দেখিয়ে বললে, "তাকে ভেতরে ধরে রেখেছি। কর্তা কিছু বকশিশ দিলে তাকে তার হাতে তুলে দি।"

এত সহজে কাজ উদ্ধার হল ভেবে এবং কল্পনার চোখে পুরস্কারের একগাদা টাকা দেখে মুলাটোটা খুশী হয়ে উঠল, বললে, "একবার তাকে দেখে যাই, তারপর কর্তাকে এ সুখবরটা দেব।"

সে দরজাটা ঠেলে অগ্রবর্তী হল। বাড়ির অন্ধকার গলিপথটার ভেতর খানিকটা এগোতেই জো বাঘের মত তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল। রাস্তার আলোয় একটা লম্বা ছুরি নিমেষের জন্য চকমক করে উঠল। তারপর জো যখন তাকে আলোতে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল তখন আর মুলাটোটার জ্ঞান নেই। তার বাঁ হাতের কবজির হাড় ভাঙা, এবং জো'র বাম পুরোবাহুর একটা স্থান ছোরার ঘায়ে চিরে গিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। খিড়কির দরজা খুলে মহাবলবান্ জো সেই বৃহৎকায় মুলাটোটাকে কাঁধে ফেলে প্রায় দুশো গজ দূরে আবর্জনার গহ্বরে নামিয়ে দিলে। তারপর এক-দৌড়ে বাড়ি এসে তৎক্ষণাৎ তার বাইকটায় চেপে গৃহত্যাগ করলে। ত্রিভুবনে জো'র আপনার জন বলতে কেউ ছিল না।

* * * *

সদর দরজাটা বন্ধ করে সঞ্জীবকে সঙ্গে নিয়ে অবনী তার বাড়ির দোতলায় একটা ঘরে গেল। ঘরটা বাড়ির পিছন দিকে, তার নীচেই

বাগান। সেদিকটা বেশ নিরিবিলি। অবনীর স্ত্রী শান্তি সঞ্জীবকে আশ্চর্য করে দিয়ে বললে, "আমি তোমাদের সকলকে বেশ চিনি। আমার বাবার সঙ্গে আমি অনেক বার তোমাদের বাড়িতে গিয়েছি। তুমি তখন অবশ্য ছোট ছিলে। আমার বাবার নাম জিতেন বসু, তিনি ফতেপুরে ওকালতি করেন। আমার বাবার সঙ্গে তারাপদবাবুর বিশেষ বন্ধুত্ব আছে।" সঞ্জীব জিতেনবাবুকে চিনত। শান্তি তাঁর কন্যা জেনে সে অত্যন্ত আনন্দিত হল। তার মনে হল, সে যেন পরমাত্মীয়দের মাঝে এসে পড়েছে।

অবনী বললে, "তোমাকে আমি গোপনে যতদূর সাহায্য করতে পারি তা অবশ্য করব, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই পারব না। এত ব্যাপারের পর নিশ্চয়ই তোমার পেছনে লোক লাগবে। একে নিগ্রো বা মুলাটোরা ভয়ংকর জীব, তার সঙ্গে যদি চীনা বদমায়েশ জুটে যায়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা হবে। ওই পীতমূর্তি, বাঁকা চোখ তির্যক ভ্রূ-ওয়ালা লোকগুলোর মত নিষ্ঠুর মানুষ পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই। টাকার জন্য ওরা অন্য লোকের পিছু লাগে বটে। কিন্তু ওই পিছু-লাগার উন্মাদনায় ওরা মেতে ওঠে আর নির্মম শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। সে শত্রুতাটা ওরা আর নিজেদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভোলে না! যদি এতক্ষণে ওরা তোমার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে থাকে তাহলে তোমার আর বেশীক্ষণ আমার বাড়িতে লুকিয়ে থাকা হবে না।

খানিক পরে তাদের কথার মাঝে ইলেকট্রিক ঘণ্টা বেজে উঠল। অবনীর মাদ্রাজী বেহারাটা এসে খবর দিলে যে জো এসেছে এবং অবিলম্বে তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। সঞ্জীব ও অবনী তখনি নীচে নেমে গেল।

দেখা হতেই জো এক নিশ্বাসে সব ঘটনা তাদের গোচর করে বললে. "আর এক মিনিট সময় নেই, এখনি পালাতে হবে। মিষ্টার গুহ, আপনার মোটরবাইকটা নেব। আপনি গাড্নারের টাকাগুলো রাখুন, তা নিয়ে যা হয় করবেন, আমাদের সঙ্গে শুধু হাজার টাকা থাকবে, আর থাকবে এইটা।—বলে সে পকেট থেকে হেঙ্গলারের রিভলভারটা বার করলে। তারপর আবার বললে, "তা-ও ওটার আর ফালতু গুলি নেই। যা আছে তা ফুরোলে আমাদের এই দু'জোড়া ভগবানদত্ত বাহু ভরসা হবে।"

অবনী রিভলভারটা হাতে নিয়ে দেখে বললে, "এ রিভলভার আমারও একটা আছে, গোটা পঁচিশেক কার্তুজ আমি দিতে পারব।"

অবনী তাদের কিছু খুচরো টাকা, কিছু শুকনো খাবার, হরলিক, দুধের বড়ি আর একটা জলের বোতল দিলে। তাদের এমন সজ্জা হল যেন তারা ধীরে-সুস্থে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে না। তারপর পরামর্শ হল কোন্ দিকে তারা যাবে। জোহোরের পথ দিয়ে শ্যাম কিংবা বর্মা, অথবা প্রণালী পার হয়ে সুমাত্রা যাবে। জো বললে, "জলপথে ধ'রা পড়ার ভয় বেশী, আমরা ডাঙায় ডাঙায় উত্তর দিকে পালাব।"

মোটরবাইকে পরিপূর্ণ করে তেল ভরা হল, কিছু তারা সঙ্গেও নিলে। তারপর এদিকওদিক দেখে জো আর সঞ্জীব বেরিয়ে পড়ল। সৌভাগ্যক্রমে তারা দু'জনেই মোটরবাইক চালাতে জানত। জো হল চালক এবং সঞ্জীব তার পিছনে বসল। জো'র পকেটে সেই চুরি-করা রিভলভারটা। মাঝ রাত্রের নির্জন রাস্তা দিয়ে অবনীর সেভেন-নাইন এক্সেলসিয়র আকাশের বাজপাখির গতিকে হার মানিয়ে ছুটল।

সিঙ্গাপুরের উত্তর ফটকের খানিক দূরে এসে জো গাড়ি থামিয়ে বললে, "এইখানেই আমাদের প্রথম বাধা। শিখ পুলিস সব খবর না নিয়ে এত রাত্রে এগিয়ে যেতে দেবে না। তুমি সতর্ক হয়ে থেকো, আমি একবার সেপাইটার সঙ্গে আলাপ করে দেখি। যদি কোন রকমে আক্রান্ত হও বা বেগতিক দেখ তাহলে যেদিকে পার পালিও।"

সঞ্জীব দূর থেকে দেখলে যে রাস্তার একটা আলোর নীচে জো একজন দীর্ঘকায় পাগড়িধারী লোকের সঙ্গে হাত নেড়ে কথা কইছে। দ্বিতীয় মুহূর্তে কিন্তু জো'র ডান হাতটা সে-লোকটার মুখে গিয়ে লাগল আর সে ধরাশায়ী হল। জো তার ওপর ঝুঁকে পড়ল, আলোর নীচের অন্ধকারে আর তাকে দেখা গেল না। তারপর ফটকটার লাল আলোটা ঘুরে সবুজ আলো হয়ে গেল! জো'র সাড়া এল, "এগিয়ে এস ভায়া।" মোটরবাইকটা গর্জন করে উঠল, এক নিমেষে খোলা ফটকের কাছে পৌঁছে জো'কে পেছনে তুলে নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল।

জো বললে, "বিপদটা বেড়ে গেল ভায়া! এতক্ষণ হেঙ্গলারের দল শত্রু ছিল, এখন পুলিসও তাদের দলে ভিড়বে। সেপাইটাকে টাকা দিতে চাইলুম, কোন রকমেই সে রাজী হল না। কাল সকাল হতে না হতে চারদিকে খবর ছড়িয়ে যাবে যে আমরা পুলিস ঠেঙিয়েছি।" তারপর তারা মুখ বুজে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করতে লাগল। রাস্তাটা চমৎকার।

আন্দাজ ত্রিশ মাইল যাবার পর একটা বাঁকের মুখে গাড়িটার গতি কমাতে হল। সেখানে রাস্তার দু'পাশের জমি বেশ নীচু আর অসমতল। হঠাৎ রাস্তার দু'পাশ থেকে দু'জন লোক যেন

ভূগর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়ে তাদের পথরোধ করলে। পাছে তারা হাতের দীর্ঘ বাঁশ দিয়ে বাইকটাকে অচল করে দেয় সেই ভয়ে সঞ্জীব গাড়িটা থামালে! জো-ও বললে, "নেমে পড় ভায়া। এ-ক্ষেত্রে মুখোমুখি আলাপ করা ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় নেই।"

জো'র সওয়া দু'মণ ওজনের নিরেট দেহটি অসংখ্য তার দিয়ে তৈরী মোটা তারের কাছির মত শক্তিশালী; তেমনি তার ক্ষিপ্র গতি। সারা সিঙ্গাপুরের লোকেরা জানতো যে, তার পেটের পেশী এত মজবুত যে, কোন রকম দৌড়ে গতি সঞ্চয় না করে দাঁড়ান অবস্থা থেকেই পনের-ষোল ফুট লম্বা-লাফ দিতে পারত সে। তার ওপর দীর্ঘকাল মুষ্টিযুদ্ধ করে করে তার হাতের নিশানাটাও ছিল অব্যর্থ আর তার গায়ের জোরের তো কথাই নেই। সে বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা, পৃথিবীর চাম্পিয়ান জ্যাক্ জনসনের গুরুভাই। জনসনের মত সেও রাস্তা তৈরি করবার ভারী স্টীম রোলার পেছন দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারত।

ইতিমধ্যে জো রিভলভারটা সঞ্জীবের হাতে দিয়েছিল। মোটর-বাইকটা থামবামাত্র জো দুটো পা একদিকে এনে সেখান থেকেই এক লাফে একটা চীনার ওপর পড়ল। সঞ্জীবও চকিতে দাঁড়িয়ে উঠে অন্য চীনাটার দিকে বন্দুকটাও বাগিয়ে ধরে বললে, "নড়লেই গুলি করে মারব।"

জো'র বিষয়ে তার চিন্তা করবার কিছুই ছিল না; সে অন্য চীনাটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে জো'র অপেক্ষায় রইল। জায়গাটা তখন বাইকের জোরালো আলোয় উদ্ভাসিত। জো যার ঘাড়ে পড়েছিল সে চীনাটা মোটেই দুর্বল ছিল না। সে অনেকক্ষণ জো'র

সঙ্গে ধস্তাধস্তি করলে। শেষে যখন ছিটকে পড়ল তখন চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ওস্তাদ, এবার রেহাই দাও।"

জো অবাক্ হয়ে বললে, "আরে চেঙ্, তুই? তাইত বলি, এত স্পর্ধা আর কার হবে? তা ভালই হয়েছে, তোর আর তোর স্যাঙাতের মারামারি করবার সাধটা ভাল করেই মিটিয়ে দি, আয়।" চেঙ্ সিঙ্গাপুরের একজন সেরা বদমায়েশ। জো তাড়া করতেই চীনেটা একটা ভারী ছোরা তার দিকে ছুঁড়ে মারলে। চীনা আর জাপানীরা ছোরা-নিক্ষেপে ওস্তাদ হয়ে থাকে। বাইরের উজ্জ্বল আলোয় ছোরাটা হীরের মত ঝকমক করে উঠল। চক্ষের পলক পড়তে না পড়তে জো শিক্ষিত পায়ে সরে দাঁড়াল, আর ছোরাটা রাস্তাতে আমূল বিঁধে গেল। হাতের অস্ত্র ব্যর্থ হল দেখে চীনেটা রাস্তা থেকে নেমে অন্ধকারে দৌড় দিলে। জো একমুখ হেসে অন্য চীনাটার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললে, "একবার টুপিটা তোল তো জাদু, দেখি তুমি কোন্ জন?" সঙ্গে সঙ্গে সে তার নাকের ওপর ভয়ংকর একটা মুষ্ট্যাঘাত করলে। তৎক্ষণাৎ তার নাক মুখ দিয়ে ফোয়ারার মত রক্ত ছুটল, তার দুটো দাঁত ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল। চীনেটা সে বিষম মারে পাক খেতে খেতে অবশেষে ধরাশায়ী হল।

মোটরবাইকে বসে জো বললে, "এ ব্যাটা তো সারা রাত এখানে পড়ে থাকবে, তারপর দিনকয়েক হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে আরাম করে দুধসাগু খাবে। কিন্তু গোল বাধাবে চেঙ্। তাকে আমার পালাতে দেওয়া উচিত হয়নি।"

ভোর রাত্রে তারা জোহোর পার হয়ে গেল, কোথাও আটকা পড়ল না। সিঙ্গাপুরের উত্তরে সমুদ্রের একটা প্রণালীর সাঁকো পার হতে তাদের কোন বিঘ্ন হয় নি।

আট

জোহোর বারু অতিক্রম করবার সময়ে সেই শহরে কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় নেবার কথা জো'র মনে হয়েছিল, কিন্তু নিজের মনে দ্রুতগতিতে বিতর্ক করে সে-কথাটা মন থেকে সরিয়ে দিলে সে।

গণ্ডগোল যা পাকিয়েছে তাতে সিঙ্গাপুরের কাছাকাছি কোথাও না থাকাটাই উচিত। মোটরবাইকের এক-দৌড়ে সিঙ্গাপুর থেকে যতটা সম্ভব দূরত্বে এনে ফেলা যায় বিপদ ততটাই কম হবার সম্ভাবনা। হেঙ্গলারের নিযুক্ত চেঙের দল বা পুলিসের লোক কিছু ঘুমিয়ে থাকবে না। শহরে থাকলে তাদের দ্বারা আক্রান্ত হবার ভয় যতটা বেশী খোলা মাঠে-ময়দানে ততটা নয়। ভগবান জানেন চেঙ্ কোন্ পথে গিয়েছে! পরাজিত হয়ে আগু বাড়িয়ে গিয়ে এবং আরও শক্তি-সংগ্রহ করে চেঙের তাদের জন্য পথে ওত পেতে বসে থাকা একটুও আশ্চর্য নয়। আর পুলিস? এতক্ষণে হয়ত টেলিগ্রাফের তারে তারে বিদ্যুৎপ্রবাহ তাদের খবরটা চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। হয়ত পথের বাকে বাঁকে তাদের ধরবার জন্য অসংখ্য পুলিসের লোক ফাঁদ পেতে বসে আছে। সুতরাং শহরে আশ্রয় নিয়ে একটু জিরিয়ে নেবার কথাটা জো মন থেকে তাড়িয়ে দিলে। তাদের এক্সেলসিয়র শহরের আশেপাশের রাস্তা দিয়ে উড়ে চলল।

জো সংসারে পোড় খাওয়া মানুষ। সংসারের নানা জটিলতার অভিজ্ঞতা তার ভয়-ভাবনা অনেক কমিয়ে এনেছিল। এখন তার সব

ভাবনা অসহায় সঞ্জীবকে ঘিরে। সঞ্জীব একটা বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে অন্য যা আকস্মিক বিপদে পড়েছিল তার সমগ্র গুরুত্বটুকু উপলব্ধি না করতে পারলেও সে তার কতকটা বুঝেছিল, এবং তাতেই তার স্নায়ুজাল বিবশ ও মন বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল।

জো'র ওপর তার তখনকারের নির্ভরতা সঞ্জীবের মানসিক দুর্বলতার পরিচায়ক। সে কলের পুতুলের মত তার আশ্রয়দাতার নির্দেশ অনুযায়ী চলছিল। জো যদি কপট ব্যক্তি হত অথবা সঞ্জীবের ওপর তার মনের প্রকৃত টান না জন্মাত তাহলে ছেলেটার যে কি অবস্থা হত সেটা আমরা সহজেই কল্পনা করে নিতে পারি।

জো'র কথাটা আশ্চর্য। দয়া মমতা সে কোন দিনই শেখেনি, যে জগতে তার বাস সেখানে ওসব নেই। সেখানে নীচু মনেরই খেলা, মানুষের ধর্মের কিছুই ছিল না। কিন্তু জো'র মনে সেই ধর্মটা এতকাল ঘুমিয়ে ছিল, সঞ্জীবের ছোঁওয়া পেয়ে সেটার স্ফুরণ হল। তাছাড়া, বিপদ-আপদ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা জো'র স্বভাব ; তাতে সে খেলার আনন্দ উপভোগ করত। তার যেমন প্রচণ্ড ঘা মারতে দ্বিধা হত না, ঘা খেয়ে রক্তারক্তি হলেও তেমনি কোন ভয়-ডর বা দুঃখ হত না।

তোমাদের হয়ত মনে হতে পারে যে সঞ্জীব যোদ্ধা মানুষ তার এ রকম বিবশতা বা পরনির্ভরতাটা শোভন নয়। তার জো'র সাহায্য ও বুদ্ধির ওপর নির্ভর করা উচিত হয়নি। কিন্তু আসল কথা এই যে, সঞ্জীব তখন পর্যন্ত ছিল বালক স্বভাবের শৌখিন যোদ্ধা। আসল বিপদের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে যে সাহস, অভিজ্ঞতা এবং জীবনীশক্তির দরকার, তা তার তখনও সঞ্চয় করা হয়নি।

সে-সব বই পড়ে বা কারও মুখের কথা শুনে শেখা যায় না, সংসারের ঘটনাচক্রে জড়িয়ে গিয়ে তাতে পাক খেতে খেতে শিখতে হয়। মুষ্টিযুদ্ধের আঙ্গিনার ভেতর সে ছিল বুদ্ধিমান, নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি ভাববার, প্রতি মুহূর্তে নূতন নূতন মারের সম্মুখীন হবার ক্ষমতা তার হয়েছিল। তার দেহটাও বেশ কঠিন ঘাতসহ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই সীমাটার বাইরে সে ছিল কোমল, নরম; প্রকৃতভাবে ঘাতসহ সে হয়নি। জীবনের সঙ্গে মাখামাখি আর বোঝাপড়া না করতে শিখলে কেউ শক্ত এবং প্রকৃতভাবে ঘাতসহ হতেও পারে না। কিন্তু মানুষের জীবন বড় মজার গুরু। তুমি শিখতে চাও বা না চাও, জীবন তোমাকে তার চাকার পাকে ফেলে শিখিয়ে নেবেই। এই পলায়নের মুক্ত নিরুদ্দেশ বিপদাকীর্ণ প্রান্তরে পড়ে সঞ্জীবও তাই নূতন শক্তি ও নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছিল প্রতিটি মুহূর্তে। অবশ্য সে-সব তখন তার নিজের কাছেই অপরিজ্ঞাত রয়ে গিয়েছিল।

ভোর হবার কিছু পরে তারা পথের ধারে এক গাছতলায় গিয়ে থামল। জো ঘাসের ওপর খানিক গড়াগড়ি দিয়ে আড়ষ্ট দেহটাকে বিস্তার করে সোজা করে নিয়ে উঠে বসে সঞ্জীবের পরিশ্রান্ত চোপসানো মুখটার দিকে চেয়ে রইল। তার অবস্থাটা বুঝে কোন সহানুভূতির কথা না বলে সে বললে, "ভায়া, এইবার একটু বুদ্ধি দাও তো! এবার একটু এগোলেই আমরা দুটো পথ পাব। একটা মানুষের বসতি ও শহরবহুল স্থানের ভেতর দিয়ে সেলাঙ্গরে গেছে, আর একটা জোহোরের বিখ্যাত জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ব্যাঙ্ককের পানে গেছে। কোন্ পথে যাবে? ব্যাঙ্ককের পথে যাওয়া মানে ভারতবর্ষের দিক্ থেকে আরও দূরে দূরে সরে যাওয়া।"

সঞ্জীব কোন উত্তর দিলে না, চুপ করে রইল।

জো এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "তুমি তুমি ভয় পেয়েছ ব্রাদার?" সে সঞ্জীবকে দু'হাতে তুলে ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, "ভয়টা কিসের? বিপদকে ভয়? তোমার কোমরের পকেটে রিভলভার, হাতে যথেষ্ট শক্তি, পায়ে ক্ষিপ্রতা, ওসব থাকলে বিপদ ভয়াবহ হয় না ভায়া!"

জো'র আন্তরিকতার সুর শুনে সঞ্জীব হেসে ফেললে।

জো খুশী হয়ে বললে, "ব্রাভো! এই তো চাই। আমার বুকে কান দিয়ে শোন, আমার হৃৎপিণ্ড তার নির্দিষ্ট গতি ও ছন্দে ধুকধুক করছে; ভয়ার্তের বিক্ষেপ তাতে নেই। তুমি-আমি এক উপাদানে তৈরী, আমাদের একই ধরনের রক্ত মাংস হাড়। তাছাড়া আপাতত আমরা একই ভাগ্যের ডোর দিয়ে একসঙ্গে বাঁধা। আমাদের অজানা সমুখ-পথটা হয়ত অনেক লড়াই গোপন করে রেখেছে। জীবনের সব অজানা সমুখ-পথই মরদের জন্য তা রেখেই থাকে। জীবনে অনাগত যা, তা ফুটে উঠে কাছে আসে। সেই অনাগতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তোমার আমার কাজ To hit well out and to be hit—পুরো জোরে আচ্ছাসে মার আর মার খাওয়া। সেইখানেই শুধু ইতস্ততঃ করার অবসর নেই।"

সঞ্জীবের কি মনে হল কে জানে। সে জো'র দৃষ্টি এড়িয়ে সমুখের দিগন্তে মিশে-যাওয়া পথটার পানে চেয়ে রইল। সে পথটায় সেই অনাগতের উঁকি। শেষে বললে, "তোমার বিবেচনায় যে পথে আমাদের যাওয়া উচিত তাই ধরেই চল।"

জো বললে, "এখন ব্যাঙ্ককের পানে যাওয়া যাক, তারপর পথের ঘটনা যেমন পথ করে দেবে তাই ধরে চলা যাবে।"

শিক্ষিতের সংস্কারের দ্বারা সঞ্জীব বুঝলে যে ওটা জো'র যোদ্ধমনের কথা, যা বর্তমানের সুযোগ আর অসুবিধার হিসাবটাই রাখে ; সুদূর অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতকে কল্পনা করে মনকে বৃথা ভারাক্রান্ত করে না।

সঞ্জীব জো'র দেওয়া বিস্কুট, হরলিক ও দুধের বড়ি চর্বণ করতে রত হল। জো গোটা দুই বিস্কুট মুখে পুরে বাইকটা পরীক্ষা করতে লাগল। তারপর বললে, "সব ঠিক হ্যায়, ভায়া। শুধু পেট্রোল কমেছে, মাইল কয়েক আগের ডিপো থেকে এবার খানিক পেট্রোল কিনতে হবে।"

ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে তারা আবার রওনা হল এবং দেখতে দেখতে একটা পেট্রোলের দোকানে গিয়ে হাজির হল। সঞ্জীব সেখানে চুপ করেই রইল এবং জো মাদ্রাজী দোকানীটার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলে, অর্থাৎ জানবার মত কোন খবর আছে কিনা সেই সন্ধানে রত হল।

দোকানী তাদের গন্তব্য স্থান কোথায় জানতে চাইলে জো অম্লান বদনে বললে যে তাদের দৌড় আমহার্স্ট পর্যন্ত। পূর্বদিকে সুদূরে আমহার্স্ট একটা সমুদ্রতীরবর্তী শহর। তারপর দোকানীর নানা বেসাতির দোকান থেকে কয়েক প্যাকেট সিগারেট ও দেশলাই কিনে নিয়ে তারা আবার পথে অগ্রসর হল।

বাইকটা চালাতে চালাতে জো বললে, "আঃ বাঁচলুম ! তামাক খেয়ে আমার সাহস আবার ফিরে এল ব্রাদার। এতক্ষণ আমি মনমরা হয়ে ছিলুম। এখন কিন্তু নরম বিছানায় শুয়ে দিব্য একটা

সঞ্জীব হঠাৎ হেঙ্গলারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মুখে ঘুসিবৃষ্টি
করতে লাগল

লম্বা ঘুম দিতে ইচ্ছে করছে।” সূর্যের আলো যেমন জীবন দেয় তেমনি ভীতকে ভয়শূন্য ও ব্যথিতকে আনন্দিত করে। জো মালয়দেশের শীতের দিনে সূর্যকিরণে উৎফুল্ল হয়ে মনের খুশীতে গলা ছেড়ে একটা নিগ্রো গান জুড়ে দিলে। মোটরবাইকের একঘেয়ে ফটফট শব্দ গানটার তাল রাখতে লাগল। তার বেপরোয়া ভাব সঞ্জীবের মনকে স্পর্শ করে তাকেও ভয়ভাবনাশূন্য করে দিলে।

*   *   *

পরাজিত হয়ে চেঙ্ এক-দৌড়ে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ল। অদূরে একটা ফাঁকা জায়গায় দীর্ঘাকৃতি একখানা ল্যান্সিয়া রেসিং মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, তাতে বসে ছিল অপমান-জর্জরিত হিংস্র হেঙ্গলার। চেঙ্‌কে অবনতমস্তকে এসে দাঁড়াতে দেখে হেঙ্গলার নিজের ভাষায় গালাগালি দিয়ে উঠল, কিন্তু এই নিবিড় জঙ্গলের নির্জনতার মাঝে চেঙ্‌কে আঘাত করতে তার সাহস হল না।

চীনেটা জো'র সঙ্গে সাক্ষাতের সব ব্যাপারটা বর্ণনা করে বললে যে অদৃষ্ট অত্যন্ত সুপ্রসন্ন না হলে জো'কে বাগে আনা সম্ভব নয়। এবার অপ্রস্তুত অবস্থায় তাকে ধরতে হবে।

হেঙ্গলার বললে, “তাহলে এই গাড়িটা নিয়ে তোমরা এখনি এগোও।” কিন্তু যখন চেঙ্ বললে যে তার সঙ্গী আহত ও অজ্ঞান হয়ে পথের ধারে পড়ে আছে, তার ব্যবস্থা করা দরকার, তখন হেঙ্গলার বোমার মত ফেটে উঠল।

সে চিৎকার করে বললে, “তোমরা দেরি কর, আর তারা এগিয়ে যাক!” চেঙের কুতকুতে তেরছা চোখ দুটো জ্বলে উঠল আর তার হাত আপনা-আপনি কটিবন্ধে একটা শক্ত তীক্ষ্ণ জিনিসে গিয়ে

লাগল। চেঙের এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করে হেঙ্গলার তৎক্ষণাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

আহত লোকটাকে তুলে নিয়ে তারা শহরে ঢুকে একটা ট্যাক্সির আড্ডায় গেল। হেঙ্গলার তাকে নিয়ে একটা অন্য গাড়িতে উঠতেই ল্যান্সিয়া গাড়িটা আবার প্রভঞ্জনের গতিতে উত্তর মুখে ছুটল। জো আর সঞ্জীব এগিয়ে যেতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় পেয়েছিল। তারা যে প্রচণ্ড গতিতে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছিল, বড় ল্যান্সিয়া গাড়িটার তত বেগে ছোটা সম্ভব হচ্ছিল না। সকালবেলা পথের ধারে বিশ্রাম করতে গিয়ে অজ্ঞাতসারে জো একটা প্রচণ্ড ভুল করলে। চেঙের গাড়ি সেই অবসরে প্রায় পঞ্চাশ মাইল এগিয়ে এল।

চেঙ্ অতিশয় ধূর্ত লোক। সে তার একজন সাথীকে জোহোরা বারুতে নামিয়ে দিলে, যদি জো আর সঞ্জীব শহরে লুকিয়ে থাকে সে তাদের খোঁজ করবে, দরকার হলে অন্য লোক লাগাবে এবং তার ভ্রমণের পাল্লা আন্দাজ করে তারে খবর দেবে।

আর, সন্ধান যদি নাও পায় চেঙের নির্দিষ্ট তারঘরের দপ্তরে দপ্তরে সে খবর দেবে। সাবধানের মার নেই জেনে যদিও চেঙ এ ব্যবস্থা করলে তার মনে হয়েছিল যে জো আর সঞ্জীব কাছাকাছি কোথাও থামবে না। সমুদ্রের উপকূলে গিয়ে জাহাজ ধরবার সুবিধা হবে বলে তারা সেলাঙ্গরের দিকেই যাবে। কিন্তু তার হিসাবে ভুল হল, কারণ পুলিসের সঙ্গে জো'র সংঘর্ষের কথাটা চেঙের জানা ছিল না।

ল্যান্সিয়ার জার্মান চালক আপনার মনে গাড়ি চালাচ্ছিল। সকালবেলা পথের ধারে এক জায়গায় কাগজের একটা বড় টুকরো

ইতস্ততঃ উড়ে বেড়াচ্ছে দেখে সে তাতে চেঙের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গাড়িটার গতি কমালে এবং পরমুহূর্তে রাস্তার ধারে গাড়িটা থামালে। একটু খোঁজাখুঁজি করতেই পথের ধারের ঘাসজমিতে মোটরবাইকের চাকার দাগ এবং খানিকটা তেলকালি দেখা গেল। চাকায় নিষ্পেষিত ঘাসগুলো তখনও সম্পূর্ণ খাড়া হয়ে ওঠেনি। জার্মানটা শিকারী লোক, পথের নানা চিহ্ন থেকে সে বন্য জন্তুর গতিবিধি আবিষ্কার করতে সমর্থ। সে চেঙ্কে বোঝালে যে মোটর-বাইকের আরোহীরা ঘণ্টাখানেক পূর্বে সে জায়গাটায় বসে বিশ্রাম করে গেছে।

আবার তারা বিপুল গতিতে সমুখ পানে ছুটল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে সেই মাদ্রাজীর পেট্রোলের দোকানে গিয়ে হাজির হল। জিজ্ঞাসা করতেই মাদ্রাজী দোকানীটা জো আর সঞ্জীব, তাদের পেট্রোল এবং সিগারেট কেনার কথা বলে দিলে। আরও বললে যে পূর্বগামী সে দু'জনের গন্তব্যস্থান আমহার্স্ট শহর, সে খবর সেই অতিকায় নিগ্রোটাই তাকে বলে গেছে।

আন্তঃপ্রাদেশিক এই সড়কটার দোমাথায় পথ ও দূরত্ব-নির্দেশক কতকগুলো শিলালিপি। ডান দিকের পথের শাখাটা গেছে ব্যাঙ্ককের দিকে এবং বাঁ দিকেরটা সেলাঙ্গরের দিকে।

অবিরত মোটরগাড়ি যাতায়াত করায় রাস্তাটায় অসংখ্য চাকার দাগ ; তা দিয়ে কেউ কিছু নির্ণয় করতে পারে না যে, কোন্ গাড়িটা কোন্ দিকে গিয়েছে। শিলালিপিও মানুষ চিনে রাখে না, বা ধমক দিলে কিংবা প্রলোভন দেখালে কোন কিছুর সন্ধান বলে দেয় না। জার্মান চালকটা পথের সংযোগস্থলে গাড়ি থামালে। তাদের মনে তখন রাস্তার মোড়ের সংশয়। সে চেঙ্কে বললে যে, যারা পালিয়ে

নিরাপদ হতে চায় তারা লোকালয়ে না গিয়ে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নেওয়াটাই বেশী পছন্দ করবে। গাড়ি থামানো আর সর্দারী করার জন্য চেঙ্ লোকটার ওপর চটে উঠল, বললে, "মিছামিছি তুমি আমাদের সময় নষ্ট করছ। অন্ততঃ আমার হুকুম মানার জন্য বাঁ-দিকেই যেতে হবে। এ দলের কর্তা আমি, তুমি নও।"

জার্মানটা একবার কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে বাঁ-দিক পানে গাড়ি চালিয়ে দিলে। বস্তুতঃপক্ষে এই অনুসরণের বিষয়ে কথা কইবার তার বিন্দুমাত্র অধিকার ছিল না। সে এসেছিল গাড়ি চালাতে এবং হেঙ্গলারের এই দামী গাড়িটার রক্ষণাবেক্ষণ করতে। কিন্তু সে নিজে শিকারী মানুষ, তাই এ অনুসরণের নেশা তাকে পেয়ে বসেছিল। কাজেই সে ওপরপড়া হয়ে বুদ্ধি দেবার লোভ সংবরণ করতে পারেনি। চেঙের কাছে অপমানিত হয়ে সে আত্মস্থ হল, একটা কথাও আর বললে না।

ছুটন্ত গাড়িতে বসে বসে তাদের সময় যেতে লাগল। আধ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হবার পর চেঙ্ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। যে কোন মুহূর্তে এইবার তারা জো আর সঞ্জীবের দেখা পাবে। কিন্তু তারা এগিয়েই চলল। না শোনা যায় মোটরবাইকের ফটফট শব্দ, না পাওয়া যায় সেটার আরোহীদের দেখা। গোটা কয়েক দক্ষিণগামী গাড়ি আর লরী তাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। চেঙের ইচ্ছা হল কোন গাড়ির যাত্রীদের থামিয়ে জো'র খবর জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু তার মনস্থির করবার পূর্বেই তাদের গাড়িটা আর একটা পেট্রোলের দোকানের সামনে এসে পড়ল। চেঙ্ জার্মানটার কাঁধ ছুঁয়ে গাড়ি থামাবার ইঙ্গিত জানালে। পেট্রোলের দোকানী জো'দের কোন খবরই

বলতে পারলে না। সে শুধু এইটুকু জানালে যে সেদিন কেন, গত তিন দিনের মধ্যে কোন মোটরবাইক সে পথে যাতায়াত করেনি।

সে কথায় ল্যান্সিয়ার চালক চেঙের দিকে চেয়ে অবজ্ঞার একটু মুচকি হাসি হাসলে। অবশেষে চেঙ্ সুবোধ শিশুর মত নরম সুরে তাকে গাড়িটা আবার পিছিয়ে ব্যাঙ্ককের পথে যেতে বললে।

* * *

পুলিসের তরফ থেকে কেউ কিন্তু সঞ্জীবদের পশ্চাদ্ধাবন করলে না। তাদের বর্ণনা দিয়ে থানায় কোন হুলিয়াও জারি হয়নি। তার কারণ সিঙ্গাপুরের সেই শিখ পুলিসটা জ্ঞান ফিরে পেয়ে জো'র নামে কোন নালিশই করলে না। তার জুড়িদার তাকে সেই অবস্থায় দেখে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করেছিল। কিন্তু শিখটা মার খাওয়ার কথাটা স্বীকার করলেও কার কাছে মার খেয়েছে তা ঘুণাক্ষরেও বললে না। তার কারণটা অতিশয় সোজা। সেই পুলিস সিপাহী সর্দার করন সিং তার সাহস ও দৈহিক বলের জন্য সারা শহরে খ্যাত ছিল। কাজেই নিজের মার খাওয়ার লজ্জার কথাটা প্রচার করে সে হাস্যাস্পদ হতে চায়নি।

জো চেঙ্কে বিন্দুমাত্রও ভয় করেনি। তার ভয় ছিল ব্রিটিশ পুলিসের কৃতান্তসম অমোঘ এবং নিরলস অনুসন্ধানকে।

নয়

দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের খর তেজে জো আর সঞ্জীব গাছের শীতল ছায়া আশ্রয় করতে বাধ্য হল। আবার কিছু বিস্কুট ও দুধের বড়ি

চিবিয়ে জলপান করতেই সঞ্জীবের নিদ্রাকর্ষণ হল। স্নেহশীলা মায়ের মত তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে জো স্নিগ্ধস্বরে বললে, "একটু ঘুমিয়ে নাও ভায়া। তোমার শরীর আর মনের উপর দিয়ে অনেক ধাক্কা গিয়েছে।"

বাহুতে মাথা রেখে দেহটা কুঞ্চিত করে সঞ্জীব তখনই ঘুমিয়ে পড়ল। জো-ও ঘাসের ওপর দেহ এলিয়ে দিয়ে ঊর্ধ্বপানে চেয়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে লাগল। আর মাইল পঞ্চাশেক অতিক্রম করলেই জোহোরের বিখ্যাত অরণ্যটার সীমানা। কয়েক ঘণ্টা পরে রাত্রিও এসে পড়বে। দিনটা ভালোয় ভালোয় প্রায় অতিবাহিত হয়ে এল। রাত্রিটা কেমন ভাবে কাটবে? সে একলা হলে কোন কথা ছিল না। তার সঙ্গে এখন একটা অসহায় বালক। রাত্রের অনাগত গোপন বিপদে শুধু নিজেকে নয়, সঞ্জীবকেও রক্ষা করতে হবে।

অনেকক্ষণ ধরে জো আগামী সম্ভাব্য বিপদের রূপ কল্পনা করতে লাগল। শেষে নিজেরই ওপর বিরক্ত হয়ে উঠে বসে সে নিজেকেই বললে, "যখন সত্যিই বিপদ ঘাড়ে এসে পড়বে তখন দেখা যাবে। এখন থেকে শুধু শুধু ভেবে মরি কেন!"

সঞ্জীবের মণিবন্ধে বাঁধা হাত-ঘড়িটার দিকে নজর পড়তেই জো ব্যস্ত হয়ে সঞ্জীবকে জাগালে এবং মুহূর্তের মধ্যে আবার তারা পথে বেরিয়ে পড়ল। অতটুকু বিশ্রাম করে সঞ্জীব সম্পূর্ণ তাজা হয়ে উঠেছিল। এবার সেই-ই মোটরবাইকটা চালাতে লাগল।

মাইল দশেক অতিক্রম করতেই সঞ্জীব লক্ষ্য করলে যে, আশ-পাশের ভূমি ক্রমশঃ বৃক্ষবহুল হয়ে উঠছে আর সুদূর দিগন্তে একটা

কালো রেখা ক্রমশঃ স্পষ্ট ও দীর্ঘ হয়ে আসছে। জো'কে এসব কথা মনে করিয়ে দিতে সে বললে, "সকালে তোমাকে যে বিখ্যাত জঙ্গলটার কথা বলেছিলাম, আমরা সেই জোহোরের জঙ্গলের কিনারায় এসে পড়েছি। দিগন্তের এই রেখাটা শুধু নিবিড় বনের নয়, ওটার সঙ্গে একটা বিরাট পর্বতমালা মিশে আছে। পাহাড় আর বন এই দুইএর সমন্বয়ে স্থানটা অপূর্ব ও ভীতিজনক হয়ে উঠেছে।

তোমাকে বলে রাখি ভায়া, এতকাল আমরা গাড়িতে বসে তোফা আরামে কাটিয়েছি। এইবার কষ্ট আরম্ভ হবে। হয়ত বা আমরা সিঙ্গাপুরের বিপদগুলো পেছনে রেখে এসেছি, কিন্তু সামনে যা ঘটবার সম্ভাবনা রয়েছে তাও অবজ্ঞা করবার মত হবে না। এ রাস্তায় আশ্রয় মেলে না এমন কথা নয়, কিন্তু সরকারী ডাকবাংলো-গুলো আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে।

আমরা এখন যেখানে রয়েছি সেখান থেকে বনের ওদিকের সীমানা ছাড়িয়েও খানিকটা দেশ জোহোরের সুলতানের রাজত্ব। সেখানে শাসন ব্যবস্থাটা ঢিলেঢালা, ইংরেজের শাসন করা দেশের মত আঁটসাঁট নয়! এখানে মানুষের আদিম সংস্কারগুলো প্রখর। জানোয়ারের তো কথাই নাই। লোভী মানুষ, অর্থাৎ চোর-ডাকাতও আছে। তার ওপর বনে আছে বাঘ, শঙ্খচূড়, অজগর এবং আরও নানা জাতের হিংস্র প্রাণী।

অথচ এই বনেই হয়ত আমাদের আজকের রাত বা আরও দু' একটা রাত কাটাতে হবে। আমি ভাগ্যান্বেষী ; ভাগ্যের পিছু দৌড় দিতে দু' চারবার এদিকে আনাগোনা করেছি। কাজেই নিকট পরিচয়ে বনটা আমার কাছে কতকটা গা-সওয়া হয়ে গেছে।

তোমাকে সাহস করতে হবে, আর যতদূর পার নিজেকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। বিপদ যে হবেই এমন কোন কথা নেই, তবে হবেও না যে, এমন কথাও নেই। যদি হয়, তাই এই সব তোমাকে বলছি। আর, বিপদের মস্ত মজা কি জান ভায়া? দূর থেকে সেটাকে যত অমোঘ আর ক্রূর বলে মনে হয়, তার মধ্যে পড়ে গেলে সত্যই সেটা সেরকম মনে হয় না। সেটাকে আয়ত্ত করবার শক্তিও যেন কোথা থেকে আপনি এসে পড়ে।"

সঞ্জীব জো'র কথায় হাসল, তার বুঝতে বাকী রইল না যে, জো নিজের মনোভাব আর বেপরোয়া কথা দিয়ে একটা গুরু জিনিস হালকা করে দিতে চাইছে। সে মুখে বললে, "বুঝেছি জো।" সঞ্জীব মনে মনে সংকল্প করলে যে, সে-ও জো'র মত ভবিষ্যৎকে, অনাগতকে অবজ্ঞা করবে। তাই সে আবার বললে, "আই ডোণ্ট কেয়ার!"

জো তার এ কথায় হোহো করে হেসে উঠল, বললে, "হল না ব্রাদার! বোকার মত ফাঁকা অহংকারের ডোণ্ট কেয়ারের দেশ এ নয়; আমাদের সে অহংকার করবার অবস্থাও নয়। যুদ্ধের আখড়ায় ঢুকে প্রতিপক্ষের পাঁয়তাড়া আর তার শরীরের সব সঞ্চালন যেমন ব্যগ্রতা দিয়ে দেখে তুমি নিজেকে চালাও, নিজের কর্তব্য ঠিক কর, বর্তমান পারিপার্শ্বিকে আমাদের ঠিক সেই রকম করে চলতে হবে।"

সঞ্জীব উত্তর দিলে, "বুঝলুম! আমি তো তোমার শিষ্য, না হয় এই নূতন বিদ্যাটাতেও তোমার কাছে আমার হাতেখড়ি হবে।"

জো আবার হাহা করে হেসে উঠে বললে, "আমাকে বুঝি ঠাট্টা করছ ভায়া ?"

জো পিছন দিকে বসে। সঞ্জীব হেসে জো'র মুখটা দেখবার জন্য নিজের মুখ ফেরাবার চেষ্টা করতেই বাইকটা মাতালের মত টলে উঠল। কিন্তু সঞ্জীব তৎক্ষণাৎ সে টালটা সামলে নিলে। জো বললে, "তুমি উৎসাহিত হয়ে উঠে পথেই আমাকে মারবে দেখছি।"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে সঞ্জীব জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা জো, তোমার মধ্যে কি তোমার পূর্বপুরুষের সংস্কারটা, অর্থাৎ JUNGLE INSTINCT এখনও বর্তমান আছে ?"

"কে জানে ভায়া, হয়তো আছে !" জো উত্তর দিলে। "কিন্তু আমার সংস্কার পাকা হয়েছে লোকারণ্যে—সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো, নিউইয়র্ক, শিকাগো, সিঙ্গাপুর, আনাম, ব্যাঙ্কক্‌ ইত্যাদি স্থানে। তবে টাকার সন্ধানে দিনকতক আমি জোহোর, বোর্নিও ইত্যাদি দেশের সাংঘাতিক সব জঙ্গলে ও ফ্র্যাঙ্ক বাকের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি। ও সব জঙ্গল আমি একটু একটু চিনি।"

জঙ্গলের দুরন্ত রাজা ফ্র্যাঙ্ক বাকের কথা সঞ্জীবের অজানা ছিল না। এতকাল পরে সঞ্জীব বেশ উপলব্ধি করতে পারলে যে, তার বন্ধু ও আশ্রয়দাতা জো অজানা পথের কত বড় নির্ভরযোগ্য সহচর। জো'র প্রতি তার আকর্ষণ দ্বিগুণ বর্ধিত হল।

এ পথটাতেও মোটর-লরীর যথেষ্ট চলাচল থাকার জন্য পেট্রোলের দোকান আছে। তবে জোহোর বারুর কাছাকাছি কিংবা সেলাঙ্গরের পথের মত দোকানগুলোর ঘন ঘন অবস্থিতি নয়। এ সব

দোকানগুলো শুধু পেট্রোল বেচে না, গাড়ির ছোটখাট মেরামতি কাজ ও পথিকদলের কিছু কিছু পথের প্রয়োজনীয় জিনিস বেচার কাজও করে।

প্রায়ই দোকানীরা সপরিবারে এই সব দোকানঘরগুলোতে বাস করে। তাতে বোধ করি তাদের অসুবিধা হয় না, কারণ প্রায়ই এ দোকানগুলো ছোট গ্রাম বা বসতির সংলগ্ন। কিন্তু ব্যাঙ্ককের পথে, বিশেষ করে অরণ্যের বাহিরে ও ভেতরে এরকম কোন বসতি নেই, তাই দোকানও খুবই অল্প।

অপরাহ্ন শেষে সামনে একটা দোকান দেখে সঞ্জীব বাইক থামালে। সে নিজে বাইক থেকে নামলে না, বাইরের দুদিকে রাস্তার ওপর পা রাখলে। পেট্রোল ও কিছু আহার্যের সন্ধানে জো দোকানে গেল। মোটর বাইকখানার ভটভট শব্দে এক বিপুলকায় শিখ দোকানঘরটা থেকে বেরিয়ে এল এবং জো ও সেই লোকটি পরস্পরকে দেখে যুগপৎ হর্ষধ্বনি করে উঠল।

সঞ্জীব দেখলে যে, অতিকায় এই দুটি মানুষ আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল। তারপর দু'জনেই হাত পা মুখ নেড়ে কথা কয়ে যেতে লাগল।

আলাপের প্রথম ঝোঁকটা কেটে যেতেই জো উচ্চৈঃস্বরে সঞ্জীবকে ডাক দিলে এবং সেই শিখ জোয়ানকে বোধ হয় তারই পরিচয় দিতে লাগল। সঞ্জীব তাদের কাছে যেতেই জো বললে, "এ আমার বহু পুরানো বন্ধু, ধরমবীর সিং। সান্‌ফ্রান্সিস্কোতে আমরা এক সঙ্গে কুস্তি লড়েছি, ঘুষোঘুষি করেছি; আর যা সব করেছি তা অন্য কোন সময়ে বলব। ধরমবীরের মত জোয়ান আমেরিকাতেও বেশী নেই। এখন অদৃষ্টের তাড়নায় বোধ করি এ বিজন

পথে তেল আর তামাক বেচে এরকম একটা মানুষ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

দোকানঘরের পেছন দিকে ধরমবীরের বাসা। ছোট একটা পাকা বাড়ি, তার ছাতের ওপর চিলেকোঠার মত একটা ঘর আছে। ধরমবীর চেহারা দেখেই সঞ্জীবকে বাঙালী বলে বুঝেছিল। আমেরিকান এক নিগ্রোকে তার সহচর দেখে একটু আশ্চর্য হল। বিশেষ করে জো আর সঞ্জীব যে সমব্যবসায়ী বা আচারে সমশ্রেণীর নয়, নানা দেশে ঘা-খাওয়া মানবচরিত্রে অভিজ্ঞ ধরমবীরের সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

অল্প কথায় ধরমবীর নিজের কথা পুরানো বন্ধু জো'কে বললে, "আমি আমেরিকা ছেড়ে এসে কিছুদিন সিঙ্গাপুর পুলিসে কাজ করেছিলুম। কিন্তু অত কড়া নিয়মে থাকাটা আমার সইল না, তাছাড়া যা পেতাম তাতে পেটও ভরত না। কাজেই সেটা ছেড়ে দিয়ে কিছুকাল মোটরগাড়ি মেরামতির কাজ করলুম। অবশেষে এই দোকানটা রাখবার সরকারী ঠিকা পেয়ে এখানে এসে বছর দুই বাস করছি। এ পথটার দোকানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করা একটু শক্ত আর বিপজ্জনক বলে লাভও বেশী আর সরকারী সাহায্যও কিছু পাওয়া যায়। এখানে সঙ্গে আছে আমার ছেলে, আপাততঃ সে শহরে মাল কিনতে গিয়েছে।"

শরবতের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে জো তার বিশ্বস্ত বন্ধুকে তার সঙ্গে সঞ্জীবের সম্বন্ধ এবং পলায়নের কারণটা অল্পকথায় বলে গেল। ধরমবীর সে সব শুনে সঞ্জীবের কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললে, "মেরা বাচ্চা, মেরা শের! তুমি এমন লড়তে পার? তোমার জন্যে আমার জান কবুল; তুমি এখানে থাক।"

সঞ্জীব তার কথায় খুশী হল এবং বহুকাল পরে হিন্দি কথা কয়ে বাঁচল।

খানিক পরে জো বললে, "এইবার উঠি, ধরমবীর! আমাদের বিদায় দাও। আগু বাড়িয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। পথে আবার আশ্রয় করে নিতে হবে তো!"

ধরমবীর তার বুকে একটা ঘুষি মেরে জো'কে বসিয়ে দিয়ে বললে, "পাগল হয়েছ নাকি? এই সন্ধ্যাবেলায় জঙ্গলের মুখে যাবে আর তার ভেতরে আশ্রয় খুঁজবে। যা করবার কাল কোর, আজ তোমরা আমার অতিথি। কি বল বাবুসাহেব?"

জো বললে, "থেকে যাবার তো আমার প্রচণ্ড ইচ্ছা। কিন্তু পথে যত থামছি ততই আমাদের অনুসরণকারীরা কাছে এগিয়ে আসছে।"

ধরমবীর উত্তর দিলে, "দু'জনের জায়গায় তিনজন হলে আত্মরক্ষা করাটা আরও সহজ হবে না কি? দেখাই যাক না তোমার ঢেঙের দলটা কেমন! অবশ্য, তারা যদি এতদূরে আসে।" কুস্তিগীরের মত ধরমবীর নিজের ভীম বাহুতে সশব্দে তাল ঠুকলে এবং দেওয়ালে টাঙানো মস্ত্রার রাইফেলটার পানে সস্নেহে চেয়ে দেখলে।

সঞ্জীবের দিকে চেয়ে জো মৃদু হেসে বললে, "ভায়া, আর তো উপায় নেই। এখানেই আজ থাকতে হল দেখছি।" সঞ্জীব ধরমবীরের সঙ্গে আলাপ করে খুশী হয়েছিল; তাই তার আতিথ্য স্বীকার করতে সানন্দেই সম্মত হল সে।

মোটরবাইকটাকে রাস্তার ধার থেকে ধরমবীরের দোকানের ভেতর স্থানান্তরিত করা হলে তিনজনে আরাম করে বসে নানা গল্প

জুড়ে দিলে। সে গল্পে সঞ্জীবই হল একমাত্র বক্তা। রেমার্কের কথা, সঞ্জীবের কলকাতায় যাওয়া, হেঙ্গলারের মানুষ চুরি, জো'র সঙ্গে আলাপ ইত্যাদির কথা ধরমবীর সাগ্রহে শুনতে লাগল, আর জো সেই অবসরে আরাম করে শুয়ে নাক ডাকাতে লাগল।

ধরমবীর নিজে বেপরোয়া মানুষ, সারাজীবন ধরে সে পৃথিবীর নানা স্থানে ভাগ্যের পশ্চাদ্ধাবন করে বেড়িয়েছে। সঞ্জীবের কাহিনী তাকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করলে। সে বললে, "তোমাকে আর কি সাহায্য করব বেটা! শুধু হেঙ্গলারের ভয় থাকলে বলতাম যে এইখানেই থেকে যাও। আমরা তিন মরদে মিলে একবার তার সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিই। যুদ্ধের সময়ে আমি তার দেশের জন কুড়ি লোককে শমন-সদনে পাঠিয়ে এসেছি। আর একবার না হয় দেখা যেত। কিন্তু তোমরা যখন পুলিস ঠেঙিয়েছ তখন ব্যাঙ্কক্, মানে, তাদের এলাকাটা পার হয়ে যাওয়াই নিরাপদ হবে। তোমরা কিছু খুনে নও যে, ভিন্ন একটা রাজ্যে গিয়েও পুলিস তোমাদের অনুসরণ করবে।"

সঞ্জীব গায়ের কোটটা খুলে বসে ছিল। ধরমবীর তার কাঁধ চেপে ধরে বললে, "জো যখন তোমাকে সত্যিকারের লড়িয়ে বলেছে তখন কিছু বলবার নেই। তবুও কাছে দস্তানা থাকলে কাল তোমার সঙ্গে একহাত লড়ে দেখতুম বাবুজী।" তার কথায় সঞ্জীব খুব প্রসন্ন হল, কিন্তু লজ্জিত হয়ে ধরমবীরের চোখ থেকে নিজের চোখ নামিয়ে নিলে।

* * *

ধরমবীর তাদের দু'জনকে অল্পস্বল্প জলখাবার খাওয়ালে। সন্ধ্যার

পর বললে, "তোমরা একটু ঘুমিয়ে নাও, আমি ততক্ষণে রান্নাটি সেরে নি।" সঞ্জীব পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। দুটো বড় বালতিতে জল রাখা হয়েছে দেখে সে স্নানের লোভ সংবরণ করতে পারলে না, "সর্দারজী, এই জল দিয়ে আমি নাইতে পারি?" শিখেরা যে খুব নাইতে ভালবাসে সঞ্জীব তা জানত। কাজেই তার মনে হয়েছিল যে, ও জলটা পরদিন প্রাতে স্নান করবার জন্যই সঞ্চয় করা হয়েছে।

ধরমবীর বললে, "একটা বালতি তোমাকে দিতে পারি। এখন তো আর ঝরনায় যাওয়া চলবে না। যদিও সেটা একরকম আমার বাড়িটার পেছনেই। আর একটু পরেই সেখানে বাঘ এবং অন্য নানা জানোয়ার জল খেতে আসবে।"

"আসবে নাকি?" সঞ্জীব রোমাঞ্চিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

"জ্যোৎস্না রাত, খানিকক্ষণ ছাতে বসে থাকলেই দেখতে পাবে। দোকানের রকেও তারা মাঝে মাঝে আসে। সেজন্য এইবার দোকানের দরজাও বন্ধ করে দেব। কিন্তু ও কথা থাক, জো স্নান করতে চাইলেই মুশকিল হবে।"

জো'র ঘুম ভেঙেছিল, সে সশব্দে হেসে উঠে বললে, "তোমার ভাবতে হবে না সিং। বছরে একদিন, পবিত্র খ্রীস্টমাসের দিনটি ছাড়া আমি গায়ে জল ছোঁয়াই না। নাওয়া একটা বিশ্রী কুসংস্কার। গায়ে খানিকটা জল ঢেলে তোমাদের কি লাভ হয়?"

স্নান করে সঞ্জীবের দেহ স্নিগ্ধ হল। ধরমবীরের পাকশালা থেকে মাংসের ভুরভুরে গন্ধ এসে সঞ্জীব আর জো দু'জনের পেটে আগুন জ্বালিয়ে তুললে। জো মাঝে মাঝে তাগাদা দিতে থাকল, "আর কত

দেরি, সিং? আমার যে আর তর সইছে না। আমার বেল্টের সব কটা ফুটোই প্রায় টেনে বেঁধেছি যে!"

জো'র তাগাদা সত্ত্বেও ধরমবীরের রান্নাবান্না শেষ হতে দেরি হল। তিনজন জোয়ান মানুষের পেট ভরাবার ব্যবস্থা তো আর চট্ করে করা যায় না! তারপর মাটিতে একটা চাদর পেতে এই তিনজন সমধর্মী বন্ধু স্তূপাকার রুটি এবং এক ডেকচি মাংস নিয়ে খেতে বসল। ধরমবীর সঞ্জীবকে বললে, "তোমার মত লোককে এ জঙ্গলে থেকে কি আর খাওয়াব বাবুজী! খেতে হবে শুধু রুটি আর বুনো পাখির মাংস। সবজি আমরা খেতে পাইনে বললেই হয়। একটুখানি জমিতে মূলো আর গোঙলু অর্থাৎ শালগমের চাষ করেছি। তাও এখনও খাবার মত হয়নি। তোমাকে শুকনো গোঙলু আর খাওয়ালুম না।"

সঞ্জীব জানত যে, বাঙালীরা যেমন অসময়ে খাবার জন্য কপি ইত্যাদি শুকিয়ে রেখে দেয়, পঞ্জাবীরাও তেমনি শালগম টুকরো টুকরো করে কেটে শুকিয়ে সুতোয় গেঁথে মালা করে টাঙিয়ে রাখে। ধরমবীরের ঘরেও সেই রকম গোটা কয়েক মালা ঝুলছিল।

তন্দুরে সেঁকা উপাদেয় সুস্বাদু রুটির পাহাড় ও বিরাট ডেকচির মাংস এই চরম ক্ষুধার্ত মানুষ দুটিকে পূর্ণ তৃপ্তি দান করলে। জো আর সঞ্জীবের চেয়ে ধরমবীরের ক্ষুধাটাও কম বলে মনে হল না।

দশ

দেহ ক্লান্ত হলে তাড়াতাড়ি ঘুম আসে, কিন্তু অত্যধিক ক্লান্তি সময়ে সময়ে ঘুমের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। খাবার পর জো দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিল বলে সঞ্জীবের

নিদ্রাকর্ষণ হল না। দীর্ঘকাল চোখ বুজে পড়ে থেকেও ঘুমের কোন লক্ষণ না দেখতে পেয়ে সঞ্জীব উঠে পড়ল। সে পাশের দোকানঘরের দিকে চেয়ে দেখলে যে, একটা খাতা সমুখে খুলে রেখে ধরমবীর কি লেখাপড়া করছে। সঞ্জীবের সাড়া পেয়ে সে মাথা তুলে জিজ্ঞাসা করলে, "কই তুমি ঘুমাওনি? অচেনা জায়গায় তোমার বুঝি ঘুম হয় না বাবুজী?"

সঞ্জীব এগিয়ে গিয়ে উত্তর দিলে, "তা নয় সর্দারজী, আজ আমার ঘুম আসছে না। কিন্তু তুমিও তো শোওনি!"

ধরমবীর বললে, "হিসেবপত্র সেরে রোজই আমার শুতে রাত হয়ে যায়।"

তার প্রয়োজনীয় কাজটায় আর বিঘ্ন না ঘটিয়ে সঞ্জীব বললে, "তুমি কাজ কর সিংজী। আমি ছাতে গিয়ে তোমাদের ঝরনার আগন্তুকদের দেখি একটু।"

একটা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে সে ছাতে উঠে গেল। সেদিন শুক্ল-পক্ষের কোন্ তিথি তা তার মনে পড়ল না, কিন্তু জ্যোৎস্নায় সে আকৃষ্ট হল। তার ধারণাই ছিল না যে, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোন দেশে জ্যোৎস্না এত স্বচ্ছ, এত স্নিগ্ধ আর এত মনমাতান চমৎকার হতে পারে।

পথটা একটা রূপালী পাতের মত দীর্ঘ বিস্তৃত হয়ে পড়ে আছে, যেন তার ঘুমের আলস্য ধরেছে। সেটার দক্ষিণের অনেকটা অংশ দেখা যাচ্ছে! পূর্বদিকটা প্রায় গাছপালাশূন্য সমতল ভূমি। কিন্তু উত্তর ও পশ্চিম দিকটায় গাছপালা যেন সংখ্যাহীন ঘনসন্নিবিষ্ট।

ধরমবীরের বাড়িটার পিছন দিকে খানিকটা খোলা জমি। তার এক ধারে একটা টিলার ওপর থেকে একটা ক্ষুদ্র জলধারা
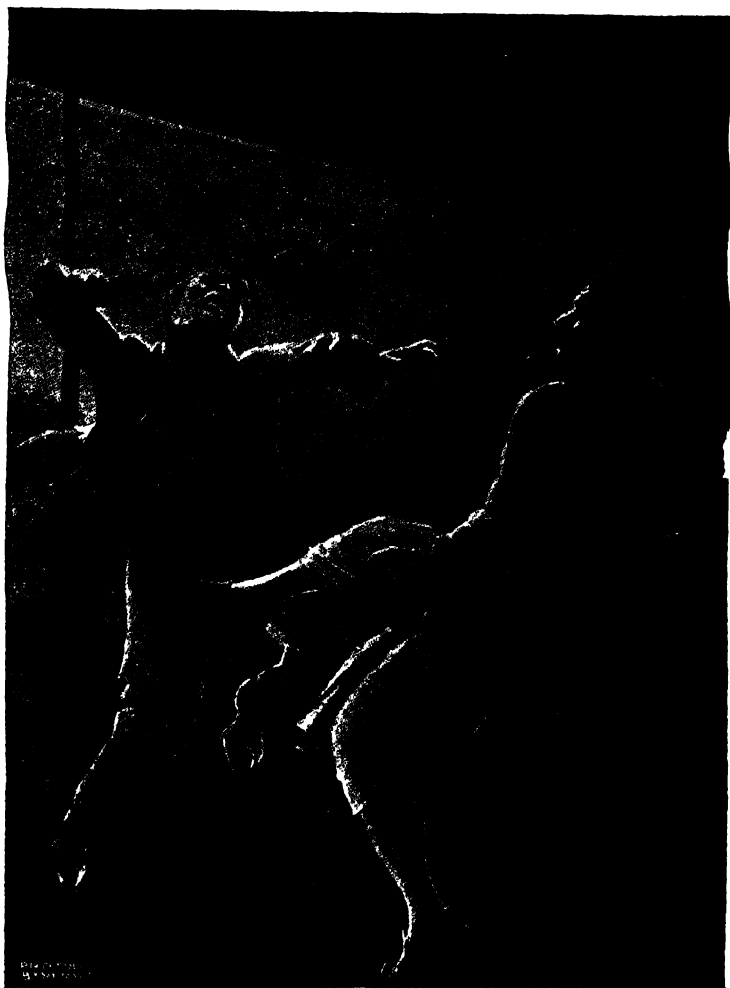
বীরবিক্রম শিখ সর্দার 'গুরুজী কী ফতে' বলে সিংহনিনাদ করে মুলাটোটাকে পদাঘাত করলে।

জ্যোৎস্নায় চিকচিক করতে করতে সর্পিল গতিতে নীচে গড়িয়ে পড়ে একটা পরিপূর্ণ নালায় পরিণত হয়েছে। প্রাকৃতিক সোপানাবলম্বী ঝরনাটা সঞ্জীবের ভারী সুন্দর বলে মনে হল। তখনি সেখানে গিয়ে তার বেড়িয়ে আসবার ইচ্ছা করতে লাগল।

সঞ্জীব এদিক ওদিক দেখছিল, বিশেষ একটা কিছুতে তার দৃষ্টি ছিল না। একটা নিশাচর পাখির শিষ শুনে ঝরনার অনতিদূরে একটা ছায়াঘন বড় গাছের ওপর তার দৃষ্টি পড়ল।

গাছটার নীচে এক জোড়া সবুজ আলো স্থির হয়ে রয়েছে। সে আলো দুটো যেন জোনাকির পুঞ্জ দিয়ে তৈরী। অতর্কিতে সঞ্জীব রোমাঞ্চিত হল। ও আলোর গল্প সে অনেক শুনেছিল। পূর্বে কখনও চোখে না দেখলেও তার কথা লোকের মুখে শুনে আর বইতে পড়ে সে আলোটা তার মানসচক্ষের গোচরীভূত বস্তু হয়ে ছিল। সে স্থিরদৃষ্টিতে সেই স্থির আলো দুটোর পানে চেয়ে রইল। খুব একদৃষ্টতে কিছু দেখলে যেন তার গতিজ্ঞান হয়। যেন অনেকক্ষণ পরে সে আলো গতিশীল হয়ে বাঁ দিকে ঘুরল এবং ক্রমশঃ আরও দু'জোড়া আলো আড়াল থেকে সেই অন্ধকারে এগিয়ে এল।

তখন পর্যন্ত সঞ্জীব ভীষণ কিছুর দেখা পায়নি। আপন মনে সে ভীষণের কল্পনাই করছিল। তার সর্বাঙ্গে তখন কাঁটা দিয়েছে। বনে বনে যারা ঘুরে বেড়ায় তারা বেশ অনুভব করে যে, বনের একটা অত্যাশ্চর্য মায়া আছে। বনের বিভীষণ জান্তব বাসিন্দারা সাক্ষাৎ যম হলেও তারা কম মায়া আকর্ষণ ছড়ায় না।

সে তন্ময় হয়ে সেই দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। অজ্ঞাতসারে তার মনে একটা ইচ্ছা ছাপিয়ে উঠল যে, চিৎকার করে সেই আলোর মালিকদের ডাকে, নিজের অস্তিত্ব তাদের জানায়।

রুদ্রকে, মৃত্যুকে ছোঁবার, তাদের অতি নিকট থেকে জানবার সকল মানুষের যে অহেতুক কৌতূহল আছে সেই কৌতূহলেই সঞ্জীবের মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

সেই কিরণহীন আলোগুলো তখনও অরণ্যের প্রগাঢ় অন্ধকারের বুকে ইতস্ততঃ সঞ্চরমাণ। হঠাৎ যেন এক জোড়া আলো সমুখ দিকে ওপর পানে লাফিয়ে উঠল এবং বায়ুমণ্ডলে একটা বৃত্তাংশ সৃষ্টি করে জ্যোৎস্নাবধৌত খোলা জায়গার পাশে অর্ধপথে, অর্থাৎ আলো-ছায়ার সংগমস্থানে এসে নিবে গেল।

রোমাঞ্চিত, ভীত, আকৃষ্ট সঞ্জীব দেখলে একটা বৃহৎকায় চিতাবাঘ আলোর আঙ্গিনায় বেরিয়ে এল, সেটার পিছনে পিছনে আর একটা বাঘও এল এবং চঞ্চল অস্থির টেরিয়র কুকুর যেমন লাফালাফি করে খেলা করে, সে দুটো বাঘও তেমনি খেলায় মেতে গেল।

আরও একটা চিতাকে দেখা গেল। সেটা নালায় মুখ ডুবিয়ে জল পান করছে। খেলায় রত বাঘ দুটোর মৃদু গর্জনে বাতাস তরঙ্গায়িত হতে লাগল। যে চিতাটা জল খাচ্ছিল সেটা মুখ তুলে সঞ্জীবের পানে চেয়ে বিকট একটা গর্জন করে উঠে এক লাফে নালাটা পার হয়ে অন্ধকারে মিশে গেল। অন্য বাঘ দুটোও খেলা থামিয়ে তখনি সেটার পিছু নিলে। বনভূমি আবার নিস্তব্ধ হল।

সঞ্জীব ছাতের আলিসার ওপর বসে ছিল। সেই রোমাঞ্চকর দৃশ্যটা দেখার পর সে আনমনে নানা কথা ভাবতে লাগল।

বনটা আপাতদৃষ্টিতে নিস্তব্ধ প্রশান্ত, কিন্তু তার ভেতর অনুক্ষণ সংহার ও আত্মরক্ষার নাটকীয় লীলা ঘটে চলেছে। সেখানে এমন একটা কীট পতঙ্গ বা প্রাণী নেই যে, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য বিপুল একটা সংগ্রামে নিত্য যোগ দেয় না। অনুসরণ, যুদ্ধ, পলায়ন

বনের জীবনধারায় প্রতিক্ষণের ঘটনা। সেখানে প্রত্যেকে যেন অন্যের জন্য ওত পেতে বসে আছে।

তবুও মানুষের জগতের মত এ জগৎটায় আর্তের কান্না নেই। দুঃখ হেথায় পীড়া দেয় না। মরণ একটা করাল আঘাতে টানে, কিন্তু সারা জীবন ধরে পলে পলে পিষে মারে না। এখানে সোজাসুজি হত্যা আছে, কিন্তু একের অন্যকে জীবন্মৃত অবস্থায় ফেলে রেখে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করবার নিষ্ঠুর রীতি নেই।

একটা ভাবনা ভাবতে গেলে সেটার সূত্র ধরে অন্য অনেক ভাবনা এসে পড়ে। সঞ্জীবের মনে পড়ল যে, তার জীবনে আকস্মিকভাবে, যেন জাদুমন্ত্রে কত না জট পাকিয়ে গেছে! সে বসে বসে নানা এলোমেলো কথা ভাবতে লাগল।

কতক্ষণ সে ভাবনার ঘোরে বসে ছিল কে জানে। হঠাৎ তার দক্ষিণ দিগন্তের পানে নজর পড়ল। তীব্র বিজলী আলোর রশ্মি ছুঁড়ে দেওয়া বর্শার ফলার মত দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। সে সেই ক্রমবর্ধমান আলোটাকে দেখতে লাগল। এমন সময় কাঠের সিঁড়ির মাথায় ধরমবীরের পাগড়ি দেখা গেল এবং তার নিবিড় কাল দাড়ির মাঝখানে সাদা দাঁতের সারি চিকচিক করে উঠল।

সে জিজ্ঞাসা করলে, "কি বেটা, এখানে বসে বসে কি সব দেখলে?" ধরমবীর ছাতে উঠে এসেই সেই উজ্জ্বল আলোটা দেখতে পেলে, বুঝলে যে একটা মোটরগাড়ি আসছে। সে বিরক্তি প্রকাশ করে বললে, "বেড়ানোর ভূতে পাওয়া ভবঘুরে আমেরিকানগুলোকে পারবার জো নেই। এই সবেমাত্র আমি দোকান বন্ধ করেছি, বাবুদের জিনিস যোগাবার জন্য হয়ত আবার এখনি খুলতে হবে। মরুক বেটারা খানিক চেঁচামেচি করে, আমি সহজে উঠছিনে।"

দোকানের সামনের দিকে একটা জোরালো পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বলে, সেদিনও সেটা জ্বলছিল।

অনতিকাল পরে একটা বিরাটাকার লম্বা গাড়ি এসে রাস্তার উপর থামল। তারপর একজন লোক নেমে এগিয়ে এল। লোকটা দোকানীকে ডাকাডাকি করতে করতে ছাদের পানে চেয়ে দেখলে। সঞ্জীব তখনি ধরমবীরের কাঁধটা টিপে ধরে মৃদুস্বরে বললে, "সর্দারজী, ওই লোকটাই চেঙ্।"

ধরমবীর চমকে উঠে বললে, "তাই নাকি?" সঞ্জীব চট্ করে আলিসার ধার থেকে সরে গেল।

ধরমবীর নীচু দিকে মুখ করে হেঁকে বললে, "এত রাতে কি চাও বাপু?"

ওপর দিকে মুখ তুলে চেঙ্ বললে, "চারজনের জন্য কিছু পানীয়, তেল, সিগারেট।"

"দাঁড়াও, আসছি।" বলে ধরমবীর সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। হামাগুড়ি দিয়ে ছাতটা পার হয়ে গিয়ে সঞ্জীবও নীচে নেমে গেল।

নীচে এসে তারা জো'কে জাগালে। জো এই সুখবরটি পেয়ে তার হলুদবরন দাঁতগুলি বার করে হাসলে। দেওয়ালের গায়ে একটা পেরেকে সঞ্জীবের কোটটা টাঙানো ছিল, সে সেটার পকেট থেকে রিভলভারটা বার করে নিজের পা'জামার পকেটে গুঁজে রাখলে। ধরমবীরও তার রাইফেলটা দেওয়াল থেকে নামিয়ে কার্তুজভরা গর্তটা একবার ভাল করে দেখে নিয়ে সেটাকে দেওয়ালের গায়ে খাড়া করে রাখলে। সে স্বর নীচু করে সঞ্জীবকে বললে, "খবরদার বেটা, নেহাৎ মুশকিলে না পড়লে গুলি চালিও না যেন!"

চেঙ্ ততক্ষণে ওদিকে চেঁচামেচি লাগিয়ে দিয়েছে। ধরমবীর

ভেতরের দরজাটা খুলেছে, তখনও লোহার গরাদে দেওয়া বাইরের পাল্লা দুটো খোলেনি। চেং তাকে দেখে গালাগালি দিয়ে উঠল।

গালাগালি শুনে শিখ সর্দারের চোখ দুটো জ্বলে উঠল, কিন্তু সে শান্ত স্বরে বললে, "তাহ'লে তুমি অন্যত্র গিয়ে জল খাওগে বাপু, এখানে হবে না। আমি পয়সা নিয়ে আমার মাল বেচি, গালাগালির কারবার করিনে।"

আরও দু'জন লোক এসে চেঙের পাশে দাঁড়িয়েছিল। ধরমবীর তাদের মুলাটো গুণ্ডা বলে চিনলে আর মনে মনে হাসলে, "হেঙ্গলার সাহেব দেখছি সব ভালই ব্যবস্থা করেছে।"

ধরমবীরকে অচল দেখে একটা মুলাটো বললে, "নাও, তোমার দরজাটা খোল দেখি বাপু। আমাদের জল দাও, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। আর, ওই গাড়িতে সাহেবটাকেও দিয়ে এস।"

ধরমবীর উত্তর দিলে, "তোমরা লোক সুবিধের নও বলে মনে হচ্ছে। এখানে এসেই এই গরীব দোকানীকে গালিগালাজ করেছ। তোমাদের সরে পড়াটাই উচিত। তবে যদি সব জিনিসের আগাম দাম চুকিয়ে দাও তো দোকান খুলতে পারি।"

চেং দ্বিরুক্তি না করে টাকা দিলে।

দোকানের বাইরের রকে বসে তারা লেমনেড খাচ্ছিল। সিগারেট ইত্যাদি নিয়ে ধরমবীর বাইরে আসতে চেং তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "একটা মোটরবাইকে দু'জন লোককে তুমি এ পথ দিয়ে যেতে দেখেছ?"

ধরমবীর উত্তর দিলে, "কই, মনে তো হচ্ছে না।"

চেং বললে, "মনে করে দেখ। ঠিক খবর দিলে আমি তোমাকে বকশিশ দেব। মিথ্যে বললে তোমার দোকান লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যাব।"

ধরমবীরের উত্তর দেবার পূর্বেই একটা মুলাটো লেমনেড খাওয়া শেষ করে উঠে দোকানের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

সে চেঙ্‌কে ডেকে বললে, "এখানে এসে দেখ, শীগগির!" সে ধরমবীরের পাশ কাটিয়ে দরজায় গেল। তাদের দর্শনীয় বস্তুটি আর কিছুই নয়, সেটা জো-সঞ্জীবের মোটরবাইক।

তখন ধরমবীরের মুখ দেখলে তারা দেখতে পেত যে, তার চোখ দুটো জ্বলছে, আর তার মুখের ভাবটাও শান্ত নয়। চেঙের জামার পকেট থেকে একটা পিস্তলের বাঁট বেরিয়ে ছিল, ধরমবীর সেটা খপ্ করে তুলে নিয়ে বললে, "এটা নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছ কেন বন্ধু?"

চেঙ্ ঘুরে দাঁড়াল এবং পিস্তলটা কেড়ে নেবার জন্য তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। বাঁ হাতে তাকে অবলীলায় ঠেলে দিয়ে ধরমবীর সজোরে পিস্তলটাকে ঝোপের দিকে ছুঁড়ে দিলে। তারপর সে চীনেটার মুখের দিকে চেয়ে হিহি করে অবজ্ঞার হাসি হাসতে লাগল। চেঙ্ এ ধরনের লোকের দামটা বেশ বুঝত। সে দু'পা পেছিয়ে গেল আর তার কুতকুতে তেরছা চোখ দুটো ঘৃণাভরে আরও কুতকুতে তেরছা হয়ে উঠল।

ধরমবীর বললে, "জাদু, তোমাদের মত লোকদের যদি ভয়ই করব তাহলে এ জঙ্গলের মাঝে একা বাস করতুম না।" তারপর সে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলে, "দোস্ত! বেটা!"

তার দোস্ত আর বেটা তখন খোলা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

একটা মুলাটো গুণ্ডা ধরমবীরের দিকে এগিয়ে এল। সেই বীরবিক্রম শিখ সর্দার হঠাৎ "গুরুজী কী ফতেহ্" বলে সিংহনিনাদ করে তাকে পদাঘাত করলে। প্রত্যহ চার হাজার বৈঠক-করা সে-পায়ের স্পর্শে মুলাটোটা রকের নীচে ছিটকে পড়ল। ধরমবীর তখন

চেঙের দিকে চেয়ে হেসে বললে, "এবার তুমি এস, বন্ধু!" জো এগিয়ে আসছিল, ধরমবীর তাকে নিবারণ করে বললে, "এরা আজ আমার অতিথি। আমাকেই আজ অতিথিসৎকারটা করতে দাও।"

চেঙ্ স্বপ্নেও ভাবেনি যে তারা এমনি করে সিংহের বিবরের ভেতর এসে পড়বে। সে আর মুলাটোটা ধরমবীরকে এক সঙ্গে আক্রমণ করলে। অনেক কালের অব্যবহারে ধরমবীরের ইস্পাতের মত পেশীগুলোয় বোধ করি মরচে পড়েছিল, যুদ্ধের গন্ধ পেয়ে সেগুলোতে দানবের শক্তি জেগে উঠল।

কুস্তিগীরেরা হাতের পাশটা দিয়ে দারুণ আঘাত করে। সে মার খেলে মনে হয় যেন মাথা ঘাড় থেকে ছিঁড়ে উড়ে গেছে। এই ভয়ানক মারটার নাম কসোটা। ধরমবীর ডান হাত দিয়ে মুলাটোটার গর্দানে কসোটা মারলে, সে তখনি কুপোকাত হল।

জো'র কণ্ঠে হর্ষধ্বনি শোনা গেল, "বাহ্।"

মুলাটোটা তো পড়ল, কিন্তু, চেঙ্ ধরমবীরের কোমর জাপটে ধরলে। চেঙের ধরার সঙ্গে সঙ্গে কুস্তির ওস্তাদ সেই শিখ বীর দেহটা একটু কাত করে বাঁ পা-টা পাশের দিকে বাড়িয়ে একটা বিষম সটকা দিতেই চেঙ যেন উড়ে গিয়ে উঠোনের মাটিতে পড়ল। ইতিমধ্যে মুলাটোটাও দাঁড়িয়ে উঠে আক্রমণ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু এক পলক সময় না দিয়েই ধরমবীর তাকে মাটিতে আছড়ে দিলে, তারপর নিজেও উঠোনে লাফিয়ে পড়ল। তিনজনে ঘোরতর যুদ্ধ লেগে গেল।

পঞ্জাবী লাথি খেয়ে প্রথম মুলাটোটার বোধ করি ঘোর লেগেছিল! সংবিৎ ফিরে পেয়ে সে উঠে দাঁড়াল এবং নিজের জামার ভেতর থেকে একটা লম্বা ছোরা বার করে যুদ্ধরত ধরমবীরের পানে পা বাড়ালে।

জো এক লাফে নীচে নেমে এল। তাকে দেখে আতঙ্কে

মুলাটোটা পিছু হাঁটতে আরম্ভ করলে, আর জো-ও তার দিকে কদমে কদমে এগোতে লাগল। যেমন করে বেড়াল ইঁদুরের দিকে এগোয়।

জো'র মুখ তখন খুনে হাসিতে ভরে গেছে। মুলাটোটা জো'র শক্তি যে কত আর তার মার যে কেমন তা ভালই জানত। সে এ কথাও জানত যে, জো জলজ্যান্ত যম, তার সঙ্গে মারামারি করতে যাওয়া বৃথা। কিন্তু পালাবার পথ না পেয়ে সব জেনেও সে একটা অসমসাহসের কাজ করে ফেললে। সে মাথার ওপর ছুরিটা তুলে জো'কে আক্রমণ করলে।

জো তার দুটো দক্ষ হাত দিয়ে যুগপৎ দুটো কাজ করলে। ডান হাতে সে মুলাটোটার ডান কবজিটা ধরে মোচড় দিলে, মড়াৎ করে শুকনো কাঠের মত তার কবজিটা ভাঙল, ছুরিটা খসে পড়ল।

মুলাটোটা নিদারুণ চিৎকার করে উঠতেই জো'র প্রচণ্ড ঘুষি এসে তার মুখ নাক সব যেন হামানদিস্তায় ফেলে থেঁতে করে দিলে। দেখতে দেখতে তার মুখটা রক্তে ভিজে গেল। তারপরে কি আর কারও জ্ঞানগম্যি থাকে। মুলাটোটা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে রইল। যেন কিছুই ঘটেনি এমনি ভাবে তার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে জো ধরমবীরের বাহাদুরি দেখতে লাগল।

ধরমবীরের শত্রু দু'জন তখন বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। সে ইচ্ছা করলেই সে সময়ে তাদের করায়ত্ত করতে পারত। কিন্তু বেড়াল যেমন আধমরা ইঁদুরকে খেলিয়ে খেলিয়ে তার শেষ বিন্দু পর্যন্ত শক্তি ক্ষয় করে মজা পায়, ধরমবীরও তেমনি করে হৃতবল চীনে ও মুলাটোটাকে বার বার আছাড় মারছিল।

তারাও কিন্তু হার না মেনে দাঁতে দাঁত দিয়ে সেই শিখ সর্দারকে আক্রমণ করছিল, যদিও সে আক্রমণ ক্ষীণ। মার খেয়ে খেয়ে মুলাটোটা

টলতে লাগল। তার মুখটা তখন পাঁউরুটির মত ফুলে উঠেছে। তার আক্রমণ লক্ষ্যশূন্য হয়ে দাঁড়াল এবং অবশেষে একটা ভীষণ আছাড় খেয়ে সে মাটি থেকে ওঠবার চেষ্টা করলে বটে কিন্তু উঠতে পারল না, তার বিরাট দেহটা ছড়িয়ে সে শুয়ে পড়ে রইল।

চেঙের জীবনী-শক্তি তার চেয়ে ঢের বেশী ছিল; তার দম তখন পর্যন্ত ফুরোয়নি। জো দেখলে চেঙের ছোরাটা এক জায়গায় পড়ে চাঁদের আলোয় চকচক করছে এবং চেঙ্ বার বার সেটার কাছে যাবার চেষ্টা করছে। অবশেষে হাতের কাছে পেয়ে সে ছোরাটাকে তুলে নিলে। কিন্তু সে হেঁট অবস্থা থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগেই ধরমবীর তার ছুরিসুদ্ধ হাতটা তারই পিঠের ওপর মুচড়ে ধরে মাথার দিকে ঠেলতে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার পাঁজরায় বিষম একটা হাঁটুর গুঁতো মারল।

চেঙের হাত থেকে ছোরাটা খসে পড়ল আর তার ডান বাহুটা কাঁধের গাঁট থেকে বেরিয়ে এসে ছেঁড়া কাপড়ের মত ঝুলতে লাগল। কিন্তু চেঙের বাহাদুরি এই যে, এমন অবস্থাতেও তার মুখ দিয়ে একটা কাতর শব্দ নির্গত হল না। বুনো জন্তুর মত সে মুখ বুজে ধরমবীরের এই ভয়ানক শেষ মারটা সহ্য করলে। চেঙ্ চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল কিন্তু সে অজ্ঞান হয়নি। তাছাড়া সে ধরমবীরের কাছে দয়াভিক্ষাও করলে না, বললে না যে, "এবার বস্ কর সর্দার!" ধরমবীর তার অসাধারণ সহ্যশক্তি ও বাহাদুরি দেখে মুগ্ধ হল। সে কড়ে আঙুল বাঁকিয়ে নিজের কপালের ঘাম আর রক্ত মুছে ফেলে চেঙের পাশে উবু হয়ে বসে বললে, "শাবাশ জওয়ান! শাবাশ হিম্মত!" শত্রুর শাবাশী যে পায় তার লড়াই সার্থক।

চেঙেদের মোটরগাড়ির জার্মান চালকটা চুপচাপ বসে এই বিচিত্র যুদ্ধটা দেখছিল। সেটা শেষ হতে দেখে সে তার গাড়ির এঞ্জিনটা

চালিয়ে দিলে। চেঙের লড়াই তার লড়াই নয়। গুণ্ডাগিরি করা তার পেশাও নয়। সে তার মালিক হেঙ্গলারের হুকুম মত লোকগুলোকে গাড়িতে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। এঞ্জিনের ধকধক শব্দ শুনে সঞ্জীব এক দৌড়ে গাড়িটার কাছে গেল আর তার পা-দানিতে লাফিয়ে উঠে জার্মানটার মাথার ওপর রিভলভার বাগিয়ে ধরে তাকে গাড়ি চালাতে নিষেধ করলে। সে লোকটাও কাঁধঝাঁকানি দিয়ে একটু মুচাক হেসে তৎক্ষণাৎ এঞ্জিনটা বন্ধ করলে আর সঞ্জীবকে গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে মাটিতে নেমে দাঁড়াল।

ধরমবীর শুধু গুণী নয়, গুণগ্রাহী মানুষ। সে চেঙের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিল। সে হাড় বসাতে জানত। আমাদের দেশের কুস্তির অনেক ওস্তাদ এই বিদ্যাটা জানে। ধরমবীর সযত্নে চেঙের কাঁধের স্থানচ্যুত হাড়টা বসিয়ে দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলে। চেঙ্ চোখ বুজে মাথা নীচু করে বসে তার সেবা নিলে।

জো, সঞ্জীব ও জার্মানটা তাদের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। ওদিকে যে আর একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছে তা কেউ টের পায়নি। মিষ্টি বা তেলের গন্ধ পেলে কোথা থেকে যে পিঁপড়ের দল আসে তা কেউ বলতে পারে না। কেমন করে ওই এতটুকু সূক্ষ্ম প্রাণী গন্ধ পায়, তা আমাদের জ্ঞানের অতীত। ইতর প্রাণীর ঘ্রাণ-শক্তি অতিশয় প্রবল, তারা সুদূরের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে কাছে আসে। জার্মানটা হঠাৎ চিৎকার করে উঠে বনের দিকে হাত বাড়ালে। সঞ্জীব ও অন্য সকলে দেখলে যে, একটা বাঘ কখন নিঃশব্দে বন থেকে বেরিয়ে এসেছে। জো যে মুলাটোটার মুখ থেঁতলে দিয়েছিল বাঘটা মৃদু গর্জন করতে করতে তার রক্তাক্ত মুখটা চাটছে।

বাঘটা এসেছিল সেই রক্তের গন্ধ পেয়ে। এক লাফে ঘরে ঢুকে ধরমবীর তার রাইফেলটা নিয়ে এল। কিন্তু ইতিমধ্যে এতগুলো

লোকের চোখের সামনে থেকে বাঘটা মুলাটোটার কাঁধ কামড়ে ধরে টানতে টানতে চক্ষের নিমেষে বনের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

চেঙ্ ও তার মুলাটো সাথীকে ঘরে বন্ধ করে রেখে বন্দুকটা নিয়ে ধরমবীর জো, সঞ্জীব ও জার্মানটার সঙ্গে বনের ভেতর দৌড় দিলে। জার্মানটার গাড়িতে একটা টোটা-ভরা বন্দুক ছিল, সে সেটা নিলে। মুলাটোটা সঞ্জীবদের সঙ্গে শত্রুতা করলেও মনুষ্যত্বের চিরন্তন দাবি তাদের বনে টেনে নিয়ে গেল। শেষ রাত্রি পর্যন্ত তারা বন-টিলা-গহ্বর সব তন্ন তন্ন করে খুঁজলে কিন্তু বাঘ বা তার অচৈতন্য শিকারের কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না।

মুলাটোটা শেষ পর্যন্ত বাঘের পেটেই গেল। বনে খুঁজে বেড়াবার সময় সঞ্জীব কয়েকটা বাঘের সাক্ষাৎ পেয়েছিল। সে মনে মনে বললে, "সর্দারজীর দেশের এসব ঘটনা আমার চিরকালই মনে থাকবে।"

পূর্বাকাশে তখন আলো দেখা দিয়েছে। চেঙ অত্যন্ত অসুস্থ। তাকে আর মুলাটোটাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ধরমবীর জার্মানটাকে বললে, "সোজা জোহোর গিয়ে এদের কোন হাসপাতালে ভরতি করে দিও সাহেব। সিঙ্গাপুর অনেক দূর।"

সে চেঙের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে তার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে, "আমি বুড়ো হতে চলেছি। অমন লড়াই লড়ে তুমি আমাকে বড় খুশী করেছ। তোমার কৃপায় আমার আয়ু কিছু বেড়ে গেল। কিন্তু এবার আমাদের দেখা হলে আর লড়ব না, কি বল?"

ধরমবীরের মহানুভবতা দেখে চেঙ্ মৃদু হাসলে এবং সঞ্জীব মুগ্ধ হয়ে গেল।

তারপর তাদের বৃহৎ গাড়িটা দেখতে দেখতে পূর্ব দিগন্তের গায়ে মিশে গেল।

এগারো

সঞ্জীব আর জো যে রাত্রে সিঙ্গাপুর ছেড়ে পালিয়ে যায় তার দু'দিন পরে সকাল বেলা রেমার্ক, অভয় ও গার্ল্যাণ্ড সিঙ্গাপুরে এসে উপস্থিত হল এবং অবনীর খোঁজে সোজা কাছারিতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলে।

অবনী তাড়াতাড়ি হাতের কাজ চুকিয়ে তাদের নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সঞ্জীবের বিষয়ে তার যা কিছু জানা ছিল বললে। সঞ্জীবের দাদা অভয় নিতান্ত কোমল প্রকৃতির মানুষ। তার মন উত্তেজিত হয়েই ছিল, অবনীর কথায় তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তৎক্ষণাৎ কিছু একটা করবার জন্য সে ব্যগ্র হয়ে উঠল।

অভয় বার বার বলতে লাগল যে, সঞ্জীব যখন সিঙ্গাপুরে নেই তখন তাদের সেখানে বসে বৃথা অপেক্ষা করে কি হবে? সব শুনে রেমার্ক কিন্তু চুপ করে রইল। রাগে তার মুখ সিঁদুরবর্ণ হয়ে গেল আর কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠল। অনেকক্ষণ পরে সে অবনীকে কেবল একটি প্রশ্ন করলে, "জো কেমন লোক?"

অবনী বললে, "ওপর থেকে তাকে ভাল বলেই তো মনে হয়েছিল। কিন্তু লোকটা নিরক্ষর ষণ্ডামার্কা, তায় আবার নিগ্রো! তার মনে কি আছে তা তো বলা যায় না। তাছাড়া, সঞ্জীবের সঙ্গে অনেক-গুলো টাকা রয়েছে, যা ওরকম লোকের বিশেষ লোভের জিনিস।"

জো'র এই পরিচয় পেয়ে অভয় তো সঞ্জীবের জন্য শোক করতে আরম্ভ করে দিলে। সে ধরে নিলে যে পথে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে জো সঞ্জীবকে খুন না করুক, অবশ্যই টাকাকড়ি কেড়ে নিয়ে তাকে ঘোর বিপদের মাঝে ফেলে পালিয়েছে। অবনী বা রেমার্ক তাকে কোন আশ্বাস না দিতে পেরে চুপ করে বসে রইল।

কথায় কথায় অবনী রেমার্ককে বললে যে, পূর্বদিন সন্ধ্যাতেও সে হেঙ্গলারকে সিঙ্গাপুরে দেখেছে। সঞ্জীবকে নিয়ে হেঙ্গলার যে হোটেলটায় থাকত অবনী সে হোটেলটার নামও বলে দিলে। সে কথাটা শোনামাত্র রেমার্ক দাঁড়িয়ে উঠে অভয়কে বললে, "তুমি এখানেই একটু বিশ্রাম করে নাও। আমি একটা বিশেষ জরুরী কাজ সেরে আসি। ফিরে এসে কি করা উচিত তা পরামর্শ করা যাবে।"

রেমার্কের ট্যাক্সি একটু পরেই তাকে সেই হোটেলে নামিয়ে দিলে। সে হোটেলের কেরানীর কাছ থেকে খবর পেলে যে, হেঙ্গলার সে হোটেলে থাকে বটে, কিন্তু তখন কোন কাজে বেরিয়ে গেছে।

রেমার্ক আর ফিরে গেল না। বার বার খবর নিতে নিতে সন্ধ্যার পর সে জানতে পারলে যে, হেঙ্গলার হোটেলে ফিরে এসেছে। তার তখনি সে বজ্জাতটাকে ধরবার ইচ্ছা হল, কিন্তু তা না করে সে অপেক্ষা করতে লাগল। সে বেশ জানত যে নেহাত শরীর খারাপ না হলে কোন ইওরোপীয় ডিনারের পর ঘরে বসে থাকে না এবং বুড়ো হাবড়াদের মত চুপচাপ বিছানায় শুয়ে পড়ে না। বিশেষ করে সিঙ্গাপুরের মত জায়গায়, যেখানে নাচ গান থিয়েটার ইত্যাদির শেষ নেই, সেখানে কেউ সন্ধ্যার পর ঘরে থাকে না।

দীর্ঘকাল অপেক্ষা করার পর রেমার্ক দেখলে যে সান্ধ্যবেশ পরে হেঙ্গলার বাইরে এল এবং হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুরুট ধরিয়ে নিয়ে রাস্তায় নামল। বেশ করে খেয়ে-দেয়ে হেঙ্গলারের দেহ মন তখন ঠাণ্ডা। আর এদিকে রাগ ছাড়া রেমার্ক ক্ষিধের জ্বালাতেও আগুন হয়ে ছিল। কিন্তু তখন আত্মসংযম করে সে তার পরম শত্রুর পেছু নিলে।

হোটেলটা একটা নিরিবিলি সাহেব পাড়ায়। সেখান থেকে সমুদ্রতীর কাছেই। তীরের খানিকটা বেশ সাজানো, উঁচু বাঁধের ধারে

লোহার রেলিঙ দেওয়া। স্থানটা বেশ মনোরম, সুতরাং অনেক লোক সেখানে বেড়াতে এসে সমুদ্রের হাওয়া খায়। জায়গাটায় সিঙ্গাপুরের বাসিন্দা ইওরোপীয়েরাই বেশী যায়। সেখানে কোন গোলমাল নেই। কেবল মাঝে মাঝে মাতাল নাবিক দু'চারটে আনন্দে মত্ত হ'য়ে একটু-আধটু চেঁচামেচি করে। ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে হেঙ্গলার রাস্তাটায় দু'একটা চক্কর দিয়ে নির্জন একটা দিকে গিয়ে জলের ধারে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ঢেউ দেখতে লাগল। যেন রেমার্কের সুবিধা করে দেবার জন্যই হেঙ্গলার অমন জায়গায় গেল।

জোরালো বিজলী আলোতে সে জায়গাটায় একেবারে দিন হয়ে গেছে। হঠাৎ রেমার্ককে সামনে দেখতে পেয়েই হেঙ্গলারের গোল রাঙা মুখ শুকিয়ে লম্বাটে পাঙ্গাশ হয়ে গেল। কিন্তু সে মিথ্যা সাহস দেখিয়ে জোর করে হাহা করে হেসে উঠল, বললে, "কি ওস্তাদ, কি মনে করে আমার পেছনে ধাওয়া করেছ? তোমার তো এখন রেঙ্গুনে থাকবার কথা! অস্কার তোমাকে তাড়িয়ে দিলে নাকি? তা বেশ, আমি তোমাকে চাকরি দিতে পারি।"

সে এক নিশ্বাসে এত কথা বলে গেল। কারণ মানুষ ভয় পেলে অনেক সময়ে বাচালতা করে, চেঁচিয়ে কথা কয়ে বিপদকে ঠেলে রাখবার চেষ্টা করে। রেমার্ক ওসব গ্রাহ্য না করে দাঁতে দাঁত ঘষে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলে, "সঞ্জীব কোথায়? তাকে নিয়ে তুমি কি করেছ?" তার কথার শব্দ সাপের ক্রুদ্ধ গর্জনের মত।

হেঙ্গলার আবার জোর-করা মিথ্যে হাসি হাসলে, বললে, "সে বাঙালী হারামজাদা আর ঘৃণ্য নিগ্রো শুয়ারটা এতক্ষণে জোহোরের জঙ্গলে কুকুর-মারা হয়েছে! তুমি কাল এসে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। পাকা খবরটা দেব।"

দেখা গেছে যে, যেখানে ভারতবাসী বা অন্য এশিয়াবাসীর বাহুল্য আছে, এমন কোন জায়গায়, আর যাই করুক, ব্যক্তিগত কোন ঝগড়া নিয়ে দু'জন ইওরোপীয়তে কখনও মারামারি করে না। মানুষে মানুষে মতভেদ আর ঝগড়া হয়েই থাকে কিন্তু এ বিষয়ে ইওরোয়পীদের অদ্ভুত একটা আত্মসংযম আছে। তারা অন্য কোন জাতির লোকের সামনে হাস্যাস্পদ হবার বা কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত কিছু করে না। এ বিষয়ে ওদের স্বভাবটা ভারী চাপা।

রেমার্ক হেঙ্গলারকে বললে, "হেঙ্গলার, যদি মরদ হও তো ওধারে বালির ওপর আরও খানিক এগিয়ে চল; না হলে এই সদর রাস্তায় দাঁড়িয়েই আমি তোমার মুখে লাথি মারব।"

মুখে সে হাজার আস্ফালন করুক, মনে হেঙ্গলার রেমার্ককে বাঘের চেয়ে বেশী ভয় করত। কেবল তার রেমার্কের ওপর যে বিজাতীয় ঘৃণা ছিল, তারই জোরে সে এগিয়ে গেল এবং রেমার্ক তাকে কিছু বলবার আগেই হঠাৎ সে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু বলীর সঙ্গে দুর্বল কতক্ষণই বা আর যুঝতে পারে? চোয়ালের ওপর বিষম জার্মান গাঁট্টা খেয়ে হেঙ্গলার বালির ওপর লুটিয়ে পড়ল। তার অমন বাহারে পোশাক ছিঁড়ে-খুঁড়ে ধূলিমলিন হয়ে গেল। হেঙ্গলারের কি অবস্থা হয়েছে তা দেখবার অপেক্ষামাত্র না করে রেমার্ক সেখান থেকে অবনীর বাড়িতে চলে গেল। হুঁশ ফিরে পেয়ে রাস্তা নির্জন হবার ও হোটেলের বাসিন্দাদের ঘুমিয়ে পড়ার অপেক্ষায় হেঙ্গলার সেই বালুচরেই বসে রইল। তার কালশিটে পড়া থেঁতো মুখ তো আর কাউকে দেখানো যায় না!

রেমার্ককে দেখে সঞ্জীবের দাদা জিজ্ঞাসা করলে, "কোথা ছিলে রেমার্ক? তোমার জন্য আমি ভাবনায় পড়েছিলুম এতক্ষণ।"

রেমার্ক উত্তর দিলে, "হেঙ্গলার আমার বন্ধু কি না! তার সঙ্গে একটু দেখা করে এলুম। তার মুখে খবর পেলুম যে সঞ্জীবেরা জোহোর জঙ্গলের পানে গেছে।"

অভয় বললে, "আমরাও গিছলুম সিঙ্গাপুর পুলিসের কর্তার কাছে। সে সঞ্জীব সংক্রান্ত কিছুই জানে না। কাল আবার আমাদের তার কাছে যেতে হবে। হেঙ্গলারকেও যেতে হবে বোধ হয়, তবে অন্য ভাবে। কি যে করব তা তার সঙ্গে দেখা না করে কিছুই স্থির করতে পারছিনে। অবনীরও মত যে, পুলিসের কর্তার পরামর্শ মতই কাজ করা উচিত হবে।"

পরদিন সকালে পুলিস অফিস থেকে টেলিফোনে খবর এল যে, বেলা দশটার সময় তাদের পুলিসের কর্তার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

তারা যথাকালে পুলিসের দপ্তরে গিয়ে হাজির হল। দেখলে যে, অফিসের বারান্দায় হেঙ্গলার বিষণ্ণ মুখে বসে আছে, তার মুখমণ্ডলে কালশিরার দাগ। সে রেমার্ককে দেখে অন্যদিকে মুখ ফেরালে।

পুলিসের অধিনায়ক বললে, "হেঙ্গলারের কাছ থেকে আমি সব খবর আদায় করেছি এবং সিঙ্গাপুরে বসে গুণ্ডামি করার জন্য তাকে বন্দীও করেছি। সঞ্জীবকে চুরি করার জন্য কলকাতার পুলিস নিশ্চয়ই ওকে খুঁজছে। তাদের কাছে এই মাত্র আমরা তার পাঠিয়েছি। রাজার আইন দিয়ে হেঙ্গলারের উচিত ব্যবস্থা হবে। এখন তোমাদের কি করা উচিত সেইটাই বিচার্য। সঞ্জীব আর তার সঙ্গী কোন্ পথে গিয়েছে তা হেঙ্গলার নিজেই জানে না। সে কথাটা ঠিক বলেই আমার মনে হচ্ছে। জার্মানটা যে গুণ্ডাদের তাদের ধরতে পাঠিয়েছে তাদেরও সেলাঙ্গর ও ব্যাঙ্কক্ দুটো পথই খোঁজ নিয়ে অনুসরণ করতে বলে দিয়েছে। আমিও সে দুটো পথের পুলিসের
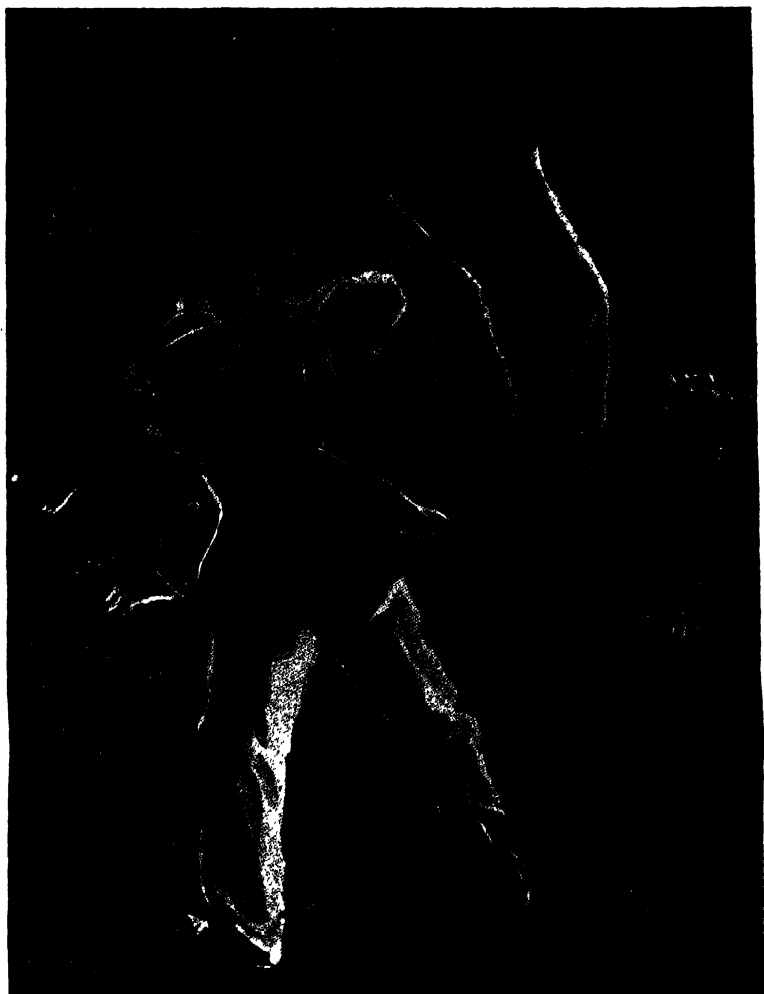
জো সেই বৃহৎকায় মুলাটোটাকে কাঁধে নিয়ে প্রায় দুশো গজ দূরে একটা আবর্জ্জনার গহ্বরে নামিয়ে দিলে।

ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছি, তাদের উত্তর অনুসারে যথোচিত ব্যবস্থাও করব এবং আপনাদের খবর দেব।”

কিন্তু বাকী দিনটায় পুলিস অফিসে বার বার খোঁজ নিয়েও কোন খবর পাওয়া গেল না। অভয়েরা অস্থির হয়ে দিনটা কাটালে। অবশেষে অপ্রত্যাশিত ভাবে সন্ধ্যার সময়ে অবনীর কাছে একটা টেলিগ্রাম এল, “জো আর সঞ্জীব ভাল আছে এবং এখন বোধ হয় তারা খানিকটা নিরাপদ। তারা জাহাজ ধরবার আশায় এগিয়ে গেছে।” টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছে ধরমবীর।

এ খবরটা পেয়ে অভয় অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠল এবং অবনী ও রেমার্ক টেলিগ্রামটা নিয়ে পুলিসের কর্তার কাছে ছুটল। সেও তার টেলিগ্রামগুলোর অনেক উত্তর পেয়েছিল, কিন্তু একটাতেও সঞ্জীবদের কোনই খবর ছিল না।

তারপর পুলিসের দু'জন কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে অভয়েরাও সঞ্জীবের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল—অবশ্য অবনী তাদের সঙ্গে গেল না।

বারো

চেঙেরা চলে যাবার ঘণ্টাখানেক পরে জো ধরমবীরকে বললে, “এবার আমরাও রওনা হই বন্ধু। ওদের পথের শেষ আছে, আমাদের তো নেই! সে ক্ষেত্রে যতটা এগিয়ে যাওয়া যায় ততটাই ভাল।”

ধরমবীর উত্তর দিলে, “যেতে তো হবেই, খানিক বিশ্রাম করে যাও। রাতটা তো আর তেমন আরামে কাটেনি! জঙ্গলটা পার হতে তোমাদের ঘণ্টা পাঁচেক লাগবে; সে হিসেবে আরও ঘণ্টা দুই-আড়াই পরে বেরোলেও চলবে। কিন্তু আমি বলি যে, তোমরা ব্যাঙ্ককে যাবার

মতলবটা ছাড়। সেটা দূর তো বটেই, তাছাড়া এখন তোমাদের বাকী যে ভয়টা রইল, সেই পুলিসের প্রভাব ও সোজা পথটাতেই বেশী হবে। তোমরা সমুদ্রের উপকূলে কোন ছোট শহরে যাও। সেখান থেকে জাহাজ ধরে যে-কোন জায়গায় যাওয়া সহজ হবে।

মোটর-পথের একটা বৃহৎ মানচিত্র বার করে ধরমবীর জো আর সঞ্জীবকে পথটা বুঝিয়ে দিলে। অবশেষে স্থির হল যে, তারা এবার ডানদিকে ঘুরে সুবিধামত কোন একটা সমুদ্র-তীরবর্ত্তী শহরে গিয়ে উঠবে।

খাবার ব্যবস্থা করতে করতে তাদের যাত্রার সময় নিকট হয়ে এল। এমন সময়ে ধরমবীরের ছেলে তার মোটর-বাইকের পেছনে নানাবিধ জিনিস নিয়ে এসে উপস্থিত হল। তাকে এবং বিশেষ করে তার দ্রুতগামী গাড়িটা দেখে সঞ্জীব বললে, "সর্দারজী, আমি অবনীর মারফত বাড়িতে একটা খবর পাঠাতে চাই। তুমি আমার হয়ে অবনীকে খবরটা দিতে পারবে ?"

ধরমবীর বললে, "আলবত পারব, বেটা। দুটো উপায়ে খবর দেওয়া যেতে পারে, একটা মোটরলরী-চালকদের দিয়ে, অন্যটা তার করে। মাইল পঁচিশ দূরে একটা ডাকখানা আর তারঘর আছে। আমি বা আমার ছেলে সে কাজটা সহজেই করতে পারব।" চিঠি পাঠানোটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হলনা। সঞ্জীব একটা টেলিগ্রাম লিখে দিলে। ধরমবীরের ছেলে যথাসময়ে সেটা অবনীকে পাঠিয়ে এল।

ধরমবীর নিজে থেকেই সঞ্জীবদের মোটর-বাইকটা ভাল করে দেখে ও পরিষ্কার করে দিয়েছিল। তাদের বিদায় দেবার সময়ে সেই বিপুলকায় শিখবীর সঞ্জীবের কাঁধ দুটো ধরে বললে, "আগে নিরাপদে দেশে পৌঁছে যাও, বাবুজী ; তারপর আমাকে ডাক দিও। অনেক

কাল আমি দেশছাড়া, তোমার ডাকের বাহানায় একবার দেশ ঘুরে আসবো। তোমার ওপর আমার মায়া পড়ে গেছে।"

জো বাইকের আসনে বসে দু'পাশের মাটিতে তার দুটো পা ঠেকিয়ে রেখেছিল। তার স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে সে বললে, "পৃথিবীটা ভারী ছোট জায়গা, বন্ধু! ঘুরতে ফিরতে গেলেই পুরানো দোস্তদের সঙ্গে দেখা হয়েই যায়। আবার হয়ত একদিন আমাদের দেখা হবে, কি বল?"

ধরনবীর হেসে জবাব দিলে, "অবশ্যই হবে, দোস্ত!"

জো'র পায়ের চাপে বাইকটা যাবার জন্য ধকধক করে সাড়া দিলে এবং সঞ্জীব তার পেছনে বসতেই সেটা ঘাসজমিটুকু পেরিয়ে রাস্তায় উঠে উধাও হল।

জো'র মনের কথা সঞ্জীবের জানা ছিল না, কিন্তু তার নিজের মন আশ্চর্যভাবে লঘু হয়ে গিয়েছিল। বাইকটা যেন সেই লঘুতার ভাগ পেয়ে কাচের মত মসৃণ পথে তার চিন্তার গতিতে ধাবিত হচ্ছিল।

খানিকটা সময় পার হতে তারা নিবিড় বনের ভেতর প্রবেশ করলে। নিস্তব্ধ প্রশান্ত বনানী, কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। বাইকের এঞ্জিনের শব্দটা যেন তাদের দু'জনের মিলিত হৃদ্‌স্পন্দনের শব্দের মত শোনাচ্ছিল। সঞ্জীব কখনও নানা এলোমেলো কথা ভাবছে। কখনও তার মন খালি হয়ে গেলে সে এক দুই করে বাইকটার শব্দের ছন্দ গুণছে। তার ইচ্ছা করছিল যে, জো কথা কয়; কিন্তু জো তন্ময় হয়ে সমুখ পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বাইক চালিয়ে যাচ্ছিল।

চারিদিকে কেবল গাছ আর গাছ। সে দুর্ভেদ্য ঘন সবুজ পর্দাটার আড়ালে কোথায় কি আছে তা বোঝবার জো নেই। মাঝে মাঝে এক আধটা জল-ভরা নালা চোখে পড়ছিল; তাছাড়া কেবল ডালপালা আর পাতার একঘেয়ে জটিলতা।

গতি-চঞ্চল মুহূর্তগুলো সঞ্জীবের অসহ্য বোধ হতে লাগল। বেচারা উপলব্ধি করতে পারেনি যে, তার মন তখনও মানুষের সঙ্গ পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। ধরমবীরের কাছে একটুখানি থেকে তার মানুষের সাহচর্যের প্রতি লোভ বেড়ে গিয়েছিল।

তারা তখন মাইল তিরিশ পথ নিরাপদে কাটিয়েছে। হঠাৎ মোটর-বাইকটার শব্দের ছন্দটা কেটে গেল, আর দু'রশি পথ যেতে না যেতেই জো'র গাড়িটা থামানো ছাড়া গত্যন্তর রইল না। রাস্তার কিনারায় বাইকটাকে এনে তারা দু'জনে অতিশয় আগ্রহভরে সেটাকে পরীক্ষা করলে।

কোন দোষ চোখে ধরা পড়ল না বটে, কিন্তু বোধ হয় চলার বেগ থেকে একবার মুক্তি পেয়ে বাইকটা পুনরায় চলতে অস্বীকার করে বসল। মানুষের সমাজে জন্মগ্রহণ করেও জো বোধ হয় হতাশা কাকে বলে তা জানত না। সে বাইকটার কাছে পরাস্ত হলেও একমুখ হেসে বললে, "কি বল, ভায়া, এ জঙ্গলে রাত্রিবাস করবে নাকি?"

সঞ্জীবের মুখটা শুকিয়ে গেল। কারণ বিপদের সম্মুখীন হবার আগে জো অমন করে হাসে। সে কোন উত্তর দিলে না। জো বাইকটাকে ঠেলতে ঠেলতে বনের ভেতর বিরাট একটা গাছের তলায় এনে রেখে বললে, "এই বনের রাজা আজ আমাদের আশ্রয় হবে। কিন্তু সে আশ্রয় নেবার আগে আরএকবার দেখা যাক আমরা কি করতে পারি। ধরমবীর বাইকটাকে দেখে দিয়েছে, কোন ভুল করেনি নিশ্চয়ই।"

সঞ্জীব মোটর-বাইক চালাতে জানত বটে কিন্তু তার মেরামতি তার অভিজ্ঞতার ভেতর ছিল না। কিন্তু জো'র সে বিষয়ে অল্পবিস্তর পারদর্শিতা ছিল। সে একাগ্রচিত্তে কাজে লেগে গেল। তার মাঝে একবার সে মাথা তুলে বললে, "পথের ওপর নজর রেখ ব্রাদার!

দক্ষিণগামী কোন গাড়ি গেলে থামিও, যদি কোন সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু, খবরদার, কোন উত্তরমুখো গাড়ি যেন থামিও না।"

সঞ্জীব একাগ্র দৃষ্টিতে পথের পানে চেয়ে বসে রইল। কিন্তু দীর্ঘকালের ভেতর উত্তর দিকে দু'একটা গাড়ি গেলেও দক্ষিণমুখো গাড়ি একটাও এলো না। যারা সেদিকে যাবার, তারা বোধ হয় আগেই চলে গেছে।

রাস্তার ওপর তখন দিবাবসান হয়নি। জঙ্গলের ভেতর কিন্তু ঘন ছায়া বিস্তার করে সন্ধ্যা নেমে এল। যন্ত্রপাতি গুটিয়ে নিয়ে জো দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "আজ এই পর্যন্ত রইল। এখন গাছে উঠে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করা যাক।"

দেখতে দেখতে নীড়প্রত্যাগত পাখির কাকলি থেমে গিয়ে সারাটি বনানী ঝিল্লিরবে মুখর হয়ে উঠল। গাছের ছাদের ওপর স্বচ্ছ বিমল জ্যোৎস্না. কিন্তু নীচে ঘন অন্ধকার।

দিকে দিকে জোনাকি দপদপ করছে। যেন বনের অঙ্গের কালো শাড়িতে কেউ সবুজের চুমকি বসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। জো নীচের একটা ডালে। তার মাথার কাছে দুটো মোটা ডালের সংযোগস্থলে সঞ্জীব বসে ছিল। সে বললে, "বাইকের আলোটা জ্বালিয়ে রাখলে হত না জো?" সভ্য জগতের মানুষ সে, তাই আলোর নির্ভরতা যে কত তা বেশ জানে।

জো উত্তর দিলে, "তাতে ব্যাটারিটার শ্রাদ্ধ করা হবে শুধু, লাভ হবে না কিছুই! বরং বিদঘুটে সব জানোয়ার আর ডাকাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।"

দশাবিপর্যয়ে সঞ্জীবের আর পানাহারে রুচি ছিল না। কিন্তু জো ধরমবীরের তৈরী চাপাটি চর্বণে রত হল। সে বললে, "মানুষের এমন কোন অবস্থা হওয়া উচিত নয় যাতে খাওয়ায় অরুচি ধরতে পারে। পেট খালি থাকলে ভয় বেশী করে, নানা বিভীষিকা দেখা

যায় ভায়া! ভরা পেটে তেমনি সাহস আর নিজের ওপর আস্থাটা বজায় থাকে। খাবে না কোন্ দুঃখে?"

বোধকরি বনের প্রাণীদের চমকে দিতে চায়নি বলে জো নিজের রসিকতায় তার স্বভাবসিদ্ধ দরাজ গলার হাসি হেসে ওঠেনি। খাওয়া শেষ করে সে নিজের নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প মৃদুস্বরে বলতে আরম্ভ করে দিলে। তার মতলব ছিল কোন রকমে সঞ্জীবের মনকে নিযুক্ত করে রেখে তাকে ভয় না পেতে দেওয়া। অথচ জো খুব সতর্ক হয়ে ছিল। সে প্রচণ্ড সিগারেটখোর হলেও সিগারেট খেলে না, পাছে তামাকের গন্ধে আর আগুনের দ্যুতিতে জঙ্গলের অধিবাসীরা তাদের বিষয়ে সন্দিগ্ধ ও সজাগ হয়ে ওঠে।

কিন্তু গল্পে সঞ্জীবের মন গেল না। সে কেবল ধরমবীরের ছাদ থেকে দেখা পূর্বরাত্রের ঘটনাগুলো ভাবছিল। একটা জলজ্যান্ত মানুষকে বাঘে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সেই ছবিটাই তখন তার মন জুড়ে বসেছিল।

নিশীথ রাতে বিজন অরণ্যকে আচ্ছন্ন করে বিচিত্র যে সব ধ্বনি ওঠে তার জাতি নির্ণয় করা সঞ্জীবের সাধ্যাতীত। বার বার একটা পরিচিত গর্জন শুনে সে শিউরে উঠছিল। তার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ, হৃৎপিণ্ড ধড়াসধড়াস করছে। শেষে আর থাকতে না পেরে সে জো'কে নিজের মনের কথাটা জানালে।

জো তার ডালটায় উঠে এসে চুপি চুপি বললে, "ওতে আর ভয় কিসের? এখন সারারাত ধরেই তো ওসব শুনতে হবে। চিতাবাঘ গাছে চড়ে বটে, কিন্তু তা যে চড়বে না, তার কারণ এই গাছটার নীচেই আমি সাপের গর্জন শুনতে পাচ্ছি।"

সে কথা শুনে সঞ্জীব একটু নড়েচড়ে বসল। তার মাথার ভেতর শিরাগুলো দপদপ করতে লাগল। মানুষের শোনবার শক্তিটা যে

কত তীক্ষ্ণ হতে পারে তা সে ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করলে। মৃদু নিশ্বাসের মত কোন শব্দও আর তার কান এড়িয়ে গেল না।

সকল মানুষেরই দুঃখ আর সুখের নিরিখে সময়ের গতি আপেক্ষিক বলে মনে হয়। সুখ আর আনন্দের যদি হিসাব নেওয়া যায়, মনে হয় তা অত্যন্ত অল্পকাল স্থায়ী। খরস্রোতা নদীতে কুটোর মত সুখ কালস্রোতের দুর্জয় বেগে ভেসে চলে গেছে। কিন্তু দুঃখের কথাটা আলাদা। তখন যেন ক্ষণবিন্দুগুলো জড় গতিশূন্য হয়ে গিয়ে দুঃখটাকে গভীর করে অনুভব করায়।

সঞ্জীব বেচারা প্রতি মিনিটে তার হাত-ঘড়িটার দ্যুতিময় মুখটার পানে দেখছিল আর ভাবছিল যে, কখন রাত্রি প্রভাত হয়ে এই অসহ্য উৎকণ্ঠা শেষ হয়ে দিনের আলোর সঙ্গে তার ভরসা ফিরে আসবে।

আগের রাতে দেখা সেই আলোর মত এক জোড়া সবুজ আলো এধার-ওধার ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সঞ্জীবের নির্নিমেষ দৃষ্টি সে আলোটা অনুসরণ করে আসছিল। সে ভাবছিল, হয়ত এখনি বুঝি বা সে আলোটা তাদের গোপন আশ্রয়টার ওপর এসে পড়বে। সে আলো কি এক জোড়া! দেখতে দেখতে তার সংখ্যা বাড়ল। চারিদিকে সে আলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাত তিনটে পর্যন্ত আলোগুলো দূরে দূরেই রইল।

কখনও কখনও সে আলো তীরবেগে নীচে দিয়ে যাওয়া-আসা করছিল। সঞ্জীবের চোখ একাগ্র দৃষ্টিতে দেখে দেখে অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। সে তখন, অস্পষ্ট হলেও, নীচের জন্তুগুলোর আকার দেখতে পাচ্ছিল। অবশেষে একটা চিতা-বাঘ মন্থর গতিতে গাছের তলায় এসে মোটর-বাইকটাকে খানিক শুঁকলে। তাতে মানুষের গন্ধ এবং সে গন্ধটা ওপর দিকেও গেছে। বাঘটা তখন গন্ধটা অনুসরণ করে ওপর পানে চাইলে। আতঙ্কিত সঞ্জীব ভাবছিল

যেন সেই বিভীষণ দৃষ্টিটা তার বুক ফুঁড়ে ভেতরে ঢুকে গেছে। সে হাত বাড়িয়ে জো'র কাঁধ চেপে ধরলে। জো ফিসফিস করে বললে, "কোন ভয় নেই ভায়া, চুপটি করে বসে থাক।"

বাঘটা দু'চার কদম সরে গিয়ে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে বসল। সে যে কত কাল, তা আর সঞ্জীবের অনুভব রইল না। তার মনে হল সে যেন অনন্ত কাল ধরে সেই ভয়ংকর ক্রূর দৃষ্টিটা দিয়ে বিদ্ধ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে আসছে। বাঘটা নীচে বসে ছিল যেন সঞ্জীবের শিয়রে বসা অমোঘ মৃত্যুর মত। সে বাঘটার ওপর থেকে আর চোখ ফেরাতে পারছিল না। তার অস্থিরতারও সীমা নেই তখন। এ অপেক্ষা অসহ্য, সে ভাবছিল, হয় বাঘটা গাছে উঠে এসে তাদের মেরে ফেলে নিশ্চিন্ত হোক, না হয় আর কোথাও চলে যাক। সঞ্জীবের ইচ্ছা হচ্ছিল, নীচে লাফিয়ে পড়ে বাঘটাকে ক্ষেপিয়ে এই নিদারুণ অপেক্ষাটার শেষ করে দেয়।

অবশেষে বাঘটা আরও এগিয়ে এল। গভীর একটা গর্জন করে সেটা গাছের মোটা গুঁড়িটাকে আলিঙ্গন করে খানিকটা ওপরে উঠল। তার প্রসারিত ধারাল বাঁকা নখ লেগে গাছের রুক্ষ ছাল চিরে গিয়ে একটা খড়খড় শব্দ হল।

সঞ্জীবের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। সে জোড়া ডালের কোলে না বসে থাকলে হয়ত অবশ হয়ে নীচে পড়ে যেত। তবুও সে বুঝলে যে, কেন জো এই খাড়া গুঁড়িওয়ালা গাছটা বেছে নিয়েছিল। মাটি থেকে প্রায় বিশ ফুট ওপরে গাছটার ডালপালা। জো নিথর হয়ে বসে ছিল, যেন তার কোন অস্তিত্বই নেই। বাঘটা গাছের গা আঁচড়াতে আঁচড়াতে আরও খানিক উঠে এল। তখন জো'র রিভলভারটা গর্জন করে উঠল। সেই সঙ্গে বাঘটাও একটা বিকট হাঁক দিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তেরো

দিনের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জীবের সাহস ফিরে এল। সারারাত্রি নিদারুণ উদ্বেগে তার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল। গাছ থেকে নেমে এসে আকণ্ঠ জল খেয়ে তার মনে হল সে যেন একজন নূতন মানুষ হয়ে গেছে।

সঞ্জীব ভাবলে, অন্তত সমুখের দীর্ঘ দিনটা তো ভয়শূন্য! রাত্রের ভাবনা তার ছিল না, কারণ না-জানি আগামী রাত্রিটা কোথায় কাটবে। নীচের ডালটায় গুঁড়ি ঠেসান দিয়ে বসে জো হাঁ করে ঘুমোচ্ছিল। কিছুতেই যেন তার খাওয়া আর ঘুমে বাধা হয় না। জো'র পকেট থেকে রিভলভারটা তুলে নিয়ে সঞ্জীব সেটা নিজের পকেটে রাখলে, তারপর মাটিতে নেমে হাত-পা ছড়িয়ে আলস্য ভেঙে মোটর-বাইকটার প্রতি মন দিলে।

সে নিবিষ্ট মনে বাইকটার পরিচর্যা করছিল। আনাড়ি মানুষ সে, বাইকটার এটা-ওটা নাড়া-চাড়া করতে করতে নিজের ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করছিল, যেন আকস্মিকভাবে সেটার দোষটা ধরা পড়ে যায়। সেটা আপনিই যেন চলার গান গেয়ে ওঠে। অনেকক্ষণ পরে তার পেছন দিকে যেন শুকনো পাতা মাড়াবার একটু শব্দ হল। ঘুরে দাঁড়িয়েই সে দেখতে পেলে. দশ গজ দূরে একটা দীর্ঘকায় চিতাবাঘ উবু হয়ে বসে তাকে দেখছে। বাঘটার লাঙ্গুলে আক্রমণের আন্দোলন। সঞ্জীবকে সতর্ক হতে দেখেই বাঘটা চারপায়ে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে সে রিভলভারের বাঁটটা মুঠো করে ধরলে এবং সেই সঙ্গে গাছের ওপর থেকে জো বাঘটার পিঠের ওপর লাফিয়ে পড়ল।

সে গুরুভারের সংঘাতে জানোয়ারটার পেট মাটিতে গিয়ে লাগল। কিন্তু পর মুহূর্তেই সেটা পেছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে জো'কে পিঠে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

কুস্তিগীরেরা যেমন করে বগ্‌লী প্যাঁচ লাগায়, জো সেই সুযোগ পেয়ে বাঘটার সামনের দুই বগলে হাত পুরে তার ঘাড়ের ওপর নিজের দু'হাত অঙ্গুলিবদ্ধ করে চেপে ধরলে। এ ডবল বগ্‌লীর ভয়ানক প্যাঁচ বোধ করি বাঘেও সইতে পারে না, তাই চিতাটা থ্যাবড়া হয়ে মাটি নিলে আর ক্রোধে পাগল হয়ে বন কাঁপিয়ে ভীষণ গর্জন করতে লাগল। সে তখন জো'কে পিঠ থেকে ফেলে দেবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু সেই নিগ্রোবীর তাকে কায়দায় ফেলে তার পিঠে এঁটে সওয়ার হয়ে রইল। জো নিজের বাঁ পা-টা বাঘটার পেছনের একটা পায়ের বগলে ঢুকিয়ে টান করে রেখেছিল। চিতাটার তিনটে পায়ে আর ঘাড়ে তখন মরণের বাঁধন। সঞ্জীব রিভলভারটা বাগিয়ে ধরেছিল, কিন্তু গুলি করবার উপায় নেই, কারণ তাহলে জো'র গায়ে গুলি লাগবে। সে হাঁ করে সেই যমে-মানুষে যুদ্ধ দেখতে লাগল। মরতেই হবে দুটোর একজনকে। কে মরে সেইটাই কথা।

বাঘটার পেছনের যে পা-টা মুক্ত ছিল সেই পা-টার থাবা দিয়ে সে জো'কে আঘাত করবার অবিশ্রান্ত চেষ্টা করছিল। যেন অনন্ত-কাল ধরে বাঘে-মানুষে সেই ভয়ানক ধস্তাধস্তিটা চলল।

হঠাৎ চিতাটা মাটিতে বুক দিয়ে পড়ল। তখন জো তার মুখটা মাটিতে ঘষতে লাগল। তার গর্জনে আকাশ-বাতাস বন যেন থরথর করে কাঁপতে লাগল। কিন্তু সেটা দুর্জয় ক্রোধ আর হিংসার গর্জন নয়, অসীম অসহ্য যন্ত্রণার বুকফাটা কান্না। জো তখন প্রায় উলঙ্গ। তার বিরাট শক্তিশালী দেহের প্রত্যেকটা পেশী চরমতম আকুঞ্চনে অপরিসীম অমোঘ শক্তি প্রয়োগ করছে। সে মরণ-প্যাঁচের দুর্জয় গাঁট বেঁধে দিয়েছে বাঘটার ঘাড়ে।

বাঘটা তখনও তার পেছনের মুক্ত পা-টা দিয়ে জো'কে বাগাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। হঠাৎ সঞ্জীব আতঙ্কিত হয়ে দেখলে যে, বাঘটার সেই পায়ের বাঁকানো ধারাল নখ জো'র ডান উরুর মাঝখান থেকে হাঁটু পর্যন্ত চিরে দিলে। কিন্তু জো'র মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরোল না। বাঘটার নাক মুখ দিয়ে রক্ত ঝরে মাটি ভিজে যাচ্ছিল, সেই রক্তে জো'র রক্তধারাও মিশে গেল।

ঠিক সেই সময়ে বাঘটার মুখ থেকে একটা ঘড়ঘড় শব্দ বেরোল এবং সশব্দে তার ঘাড়ের মেরুদণ্ডটা ভেঙে গেল। জো'র নীচে সেটা নেতিয়ে পড়ে নিথর হয়ে গেল এবং জো-ও যেন জ্ঞান হারিয়ে অবশ হয়ে চিতাটার ওপরেই পড়ে রইল।

সঞ্জীব বহু কষ্টে জো'কে মুক্ত করে বাঘটার পাশে শুইয়ে দিতেই যেন দৈবযোগে মাটি ফুঁড়ে উঠে ধরমবীর তার পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর রেমার্ক এল, তার পেছনে গার্ল্যাণ্ড, তার পেছনে অভয় আর পুলিসের লোক দু'জন।

জো'র শ্বাসপ্রশ্বাস তখন শান্ত হয়ে এসেছিল। ধরমবীর বোতল থেকে জল নিয়ে তার মুখে ঝাপটা দিলে। খানিক পরে রক্তোক্ত চক্ষু মেলে সঞ্জীবের পানে চেয়ে জো তার হলুদবরন দন্ত বিকশিত করে হাসিমুখে বললে, "রাহ্, ব্রাদার রাহ্!"

এই "রাহ্" তার যুদ্ধজয়ের আর আনন্দের ধ্বনি।

ধরমবীরের দিকে দৃষ্টি পড়তেই জো উঠে বসল। সঞ্জীবের বুক কান্নায় ভরে উঠেছিল। কিন্তু এই মহান্ পৌরুষলীলার ক্ষেত্রে অসহায়ের কান্নার স্থান নেই, তাই সে নিজের গলাটা চেপে ধরলে। এই সময় জো'র পানে চেয়ে সঞ্জীব আতঙ্কিত হল। তার কালো কুচকুচে ঘন কোঁকড়া চুল যেন জাদুমন্ত্রে সব সাদা হয়ে গেছে। তার

মুখের পেশীগুলোও গোল হয়ে গেছে। জো'র শক্তিসঞ্চয়ের শেষ প্রয়োজন যেন নিঃশেষে গেছে চুকে।

নিজেদের জামার কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে ধরমবীর আর রেমার্ক জো'র পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলে। অমানুষিক শক্তির বিপুল লীলা নিজেদের চোখে দেখে সকলে যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ জো'র মরা বাঘটার ওপর দৃষ্টি পড়ল। উপুড় হয়ে হাত বাড়িয়ে সেটার মাথা চাপড়ে দিয়ে জো বললে, "খুব লড়েছিস তুই, আমাকেও তেমনি লড়িয়েছিস! রাহ্!"

গার্ল্যণ্ডের হাতে একটা জ্বলন্ত চুরুট। তামাকের গন্ধ পেয়ে বোধ করি জো'র সিগারেট খাবার ইচ্ছা হল! অভ্যাস মত সে নিজের পকেটে হাত দিতে গিয়ে দেখলে যে তার পকেটের বালাই আর নেই, কেবল খালি গা আছে।

জো'র তামাক খাবার ঝোকটা যে কি প্রবল, আর সিগার পেলে সে যে কত খুশী হয়, তা সঞ্জীব এ কয়দিনে বেশ জেনেছিল। সে একটা চুরুট যোগাড় করে ধরিয়ে সেটা জো'র মুখে দিতেই সে অত্যন্ত খুশী হয়ে উঠল। চুরুটটায় একটা লম্বা সুখটান দিয়ে সে বললে, "আমাকে বাঁচালে ব্রাদার, আঃ!"

জো এমনভাবে কথা কইতে লাগল যেন কোন ঘটনাই ঘটেনি; যেন তার পাশের মরা বাঘটা, তার পায়ের রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজটা সবই মিথ্যা। আশ্চর্য এই যে, এর পরে একবারও জো এসব কিছুর উল্লেখ করেনি। সঞ্জীবের মুখে বাইকটার কথা শুনে ধরমবীর সেটাকে পরীক্ষা করতে লেগেছিল। অল্পক্ষণ পরেই গাড়িটার এঞ্জিন হর্‌র্‌র্ শব্দ করে উঠল। ধরমবীর নিজের কপালে হাত দিয়ে জো'কে বললে, "দোস্ত, এ নেহাত অদৃষ্টেরই খেলা। বাইকটার কিছুই হয়নি, ওটার

তেলবাহী নলে কেবল সামান্য একটুখানি ময়লা আটকে গিয়েছিল।” সামান্য একরত্তি ময়লা বিধিলিপির খেলা খেলে গেল যেন।

সকলে গাড়িতে বসল। ধরমবীরের কাঁধে ভর দিয়ে জো হেঁটে গিয়েই গাড়িতে উঠল। কারও কোলে চড়ে যেতে সে রাজী হল না। গাড়িতেও শুলে না। আসনে ঠেসান দিয়ে বসল।

ধরমবীর মরা বাঘটাকে বনে ফেলে রেখে যেতে চাইলে না, সেটাকে গাড়ীর পেছনে বেঁধে নিলে।

সে ও গার্ল্যণ্ড তারপর সঞ্জীবের মোটর-বাইকটায় উঠল। রেমার্ক আর সঞ্জীব জো'র দু'পাশে বসে ছিল। গাড়িটা দক্ষিণ মুখে ঘুরতেই জো বলে উঠল, “শেষ পর্যন্ত আমাদের পুলিসের কবলেই পড়তে হল, ভায়া!”

অভয় এতকাল চুপটি করে ছিল। বোধকরি জো'কে সন্দেহ করার জন্য সে মনে মনে অনুশোচনা করছিল। জো'র কথা শুনে সে বললে, “পুলিস তোমাদের অনুসরণ করেনি তো! বরং তোমাদের খুঁজে বার করতে আমাদের অনেক সাহায্য করছে।”

সেই শুভ সংবাদে জো'র মুখটা খুশীতে ভরে গেল। সঞ্জীবের মনে পড়ে গেল যে, এতক্ষণ জো'র সঙ্গে কারও পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। সে পরিচয় করিয়ে দিলে।

রেমার্কের পরিচয় পেয়ে জো যেন রোমাঞ্চিত হল। তার হাতে হাত রেখে বললে, “তুমিই রেমার্ক? আচ্ছা, একদিন দেখা যাবে তুমি কেমন রেমার্ক, কি উপাদানে তৈরী।”

রেমার্ক জো'র কাণ্ডকারখানা দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। সে বিনয় সহকারে উত্তর দিলে, “তোমার কাছে পরীক্ষা দেব না ওস্তাদ। সুযোগ হলে তোমার কাছে শিখবো।”

রেমার্কের বিনম্র কথায় জো'র হলুদবরন দাঁতগুলি আবার বিকশিত হল। সে নিজের স্বভাবসিদ্ধ স্বরে বললে, "রাহ্!"

গাড়িতে বসে বসে জো আর সঞ্জীব শুনলে কেমন করে রেমার্কেরা তাদের খবর পেয়ে দিন রাত ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি হাঁকিয়ে তাদের অনুসরণ করেছে।

ভোর রাত্রে তারা ধরমবীরের আস্তানায় এসে পৌঁছয়। তাকে সঙ্গে নিয়ে সেই জঙ্গলের ভেতর অনেকটা যেতেই তারা বাঘের গর্জন শুনে আকৃষ্ট হয়েছিল। অভিজ্ঞ ধরমবীর তাদের বলেছিল যে, সে গর্জনটা প্রাণঘাতী যুদ্ধের, সহজ গর্জন নয়। সেই জায়গাটায় গাড়িটার গতি একটু কমতেই রাস্তার এক ধারে অনেকগুলো পোড়া সিগারেটের টুকরোর প্রতি ধরমবীরের দৃষ্টি পড়ল। সে গাড়ীটা থামিয়ে বললে, জো আর সঞ্জীব ওই বনের ভেতরেই আছে। কারণ জো ছাড়া এত সিগারেট আর কেউ খায় না।

রাস্তা থেকে নেমে জঙ্গলে ঢুকতেই তাদের অনুমান সত্য হল। তারা স্তব্ধ হয়ে দেখলে যে, মরণের গাঁটছড়া বেঁধে বাঘের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা চলছে কার।

জো'র গায়ে একবার হাত লাগতেই সঞ্জীব চমকে উঠল, তার গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। সে যা ভয় করছিল তাই শেষে হল। রক্তক্ষয়ের গুরুতর বিপদ ছাড়া জো'র বিষাক্ত জ্বর হবার সম্ভাবনা ছিল। জো সেই ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত। কিন্তু জো'র মশগুল হয়ে চুরুটের পর চুরুট টানা দেখে কে বলবে যে, সে পুনর্বার মৃত্যুর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

ধরমবীরের আস্তানায় পৌঁছে জো শুতে রাজী হল না, রকের ওপর একটা চারপাইতে বসল। ধরমবীর তার জানা জড়িবুটির

ওষুধ দিয়ে জো'র ক্ষতস্থানটা বেঁধে দিলে। তখনও সেটা থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়নি। অভয়েরা তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শহরে নিয়ে যাবার যুক্তি করলে। কিন্তু জো'র কাছে সে-কথা বলতেই সে অভয়কে বললে, "না, গাভ্নর, তাতে লাভ হবে না কিছু। আমি বুঝতে পারছি যে আজ আমাকে যেতে হবে। তাহলে কেন মিছে উৎপাত বাড়ানো!"

সঞ্জীব ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কি বলছ জো?"

জো হোহো করে হেসে উঠে বললে, "গাড়িতে ওঠবার আগে থেকেই জানি ভায়া যে, আজ আমার শেষ দিন। আমার লড়াই আমি চুকিয়ে দিয়েছি।"

*   *   *   *

ডাক্তার আনবার আশায় ধরমবীরের ছেলে গাড়ি নিয়ে ছুটল। অভয় বললে, "যত টাকা লাগে আমি দেব।"

ধরমবীর তার ভাঁড়ার থেকে একটু কফি বার করে তৈরি করে জো'কে খেতে দিয়েছিল। সে কফি খেতে খেতে রেমার্কের সঙ্গে গল্প করছিল। তাকে এক সময়ে বললে, "রেমার্ক, সময় চলে যাবার আগে একবার দেখে যাই তুমি কেমন!"

সঞ্জীবকে বললে, "ব্রাদার, ওঠো একবার। তোমাকে কি শিখিয়েছি তা একবার রেমার্ককে দেখিয়ে দাও।" তারা দু'জনে ব্যথিত মনে খালি হাতেই জো'কে খুশী করবার চেষ্টা করলে।

তাদের পালা সারা হলে জো ধরমবীরকে বললে, "দোস্ত, এখন তুমি একবার নাম।"

ধরমবীরের মত লোকেরও কি চোখে জল আসে? মাথা নীচু করে সেই শিখবীর আস্তে আস্তে বললে, "তোমার সঙ্গে লড়ে

অনেক আনন্দ পেয়েছি। তুমি ছাড়া আর কারও সঙ্গে আমি লড়ব না বন্ধু।"

জো বোধকরি বিষের ঘোরে বাচাল হয়ে উঠেছিল। সে অনর্গল কথা কইতে আর হাসতে লাগল। একবার সে রেমার্ককে বললে, "সঞ্জীবকে তুমি তৈরি কর। এমন উপাদান আর মিলবে না। আমি থাকলে ভায়াকে আর ছেড়ে যেতুম না।"

হঠাৎ তার কি যেন মনে পড়ে গেল। সে নীচু হয়ে নিজের বুট জুতোর ফিতে খুলতে গেল।

সঞ্জীব জিজ্ঞাসা করলে, "জুতো খুলছ কেন জো?"

সে উত্তর দিলে, "জুতোর ভেতর তোমার টাকাগুলো আছে। এইবার চুকিয়ে দি।"

বিকেলের দিকে জো ঢলে পড়ল। ডাক্তার একজন এসেছিল, সে বললে, "কিছুই আর করবার নেই।"

জো তখন জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে, "জোরসে ভায়া, আরও জোরে! আরও জোরে!"

সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ যেন সে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল, "রাহ্ ব্রাদার, রাহ্!"

সেই অশিক্ষিত নিগ্রো বীর তারপর কোন দাবি, কোন নালিশ না রেখে, হাতের কাজ চরম আগ্রহে চুকিয়ে দিয়ে চিরনিদ্রার কোলে ঢলে পড়ল।

—শেষ—